KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৬/- ৬/- ৬/- ৬/-	Year of Publication : ভাদ্র, ১৩৬৫ আশ্বিন, ১৩৬৫ কার্তিক, ১৩৬৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 August '58 (0.50) SAMAK

কী পেয়েছি
কী পাইনি..

তার হিসেব ক'রে লাভ কী? জন্মসূত্রে যা' পেয়েছি, ভাল হ'লে তাকে রাখবার চেষ্টা করব, আর যা' পাইনি অথচ চাই, তা করতে হবে পাবার চেষ্টা।

আপনার চুল ভাল জাতের হ'লে আপনার একমাত্র চেষ্টা হবে তা'র গৌরবটি বজায় রাখা। আর তেমন না হ'লে ... মোট কথা চুলের জাত যেরকমই হোক না কেন, কেশরঞ্জন তেল তার শ্রীবৃদ্ধি করবেই।

কেশরঞ্জন একটি অভিজাত প্রসাধনী হলেও এর আবেদন কিন্তু সকলের মনে, যেহেতু এর ভেষজগুণটি সত্যই অনন্যসাধারণ।

কবিরাজ এন, এন সেনের
কেশরঞ্জন
অসাধারন কেশতৈল

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

৬ষ্ঠ বর্ষ
ভাদ্র ॥ ১৩৬৫

= সম্পাদক =

= আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত =

দুরন্ত গতিকে
ব্যাহত করবেন না

ইস্পাত, সিমেণ্ট, কয়লা—
সমৃদ্ধতর ভারত গঠনে যা' কিছু
সহায়ক, তার সব কিছুই অধিকতর
পরিমাণে বহন করতে
গিয়ে সময়কেও হার মানাতে
চাইছি আমরা। এই মহৎ
প্রচেষ্টার অংশীদার হিসাবে
আপনার দানও যথেষ্ট। রেলের
চাকার দুরন্ত গতিকে কেউ যদি
ব্যাহত করতে চায়, আপনি
সহ্য করবেন কখনও?
আমাদের এই গুরু দায়িত্বের
সুষ্ঠু সম্পাদনে আপনার
সহযোগিতা উৎসারিত হোক।
আপনার সাহায্যপ্রার্থী আমরা।

পূর্ব রেলওয়ে

সমকালীন

ষষ্ঠ বর্ষ : ভাদ্র ১৩৬৫

॥ সূচীপত্র ॥

প্রবন্ধ ॥ কলমের স্বাধীনতা ও মিল্টন। মুরারি ঘোষ ২৭৩
সানাই। সোমেন বসু ২৭৯
উনবিংশ শতাব্দীর শিশু পত্রিকা। অণিমা সেন ২৯৮
অনুস্মৃতি ॥ সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ২৯২
উপন্যাস ॥ এক ছিল কন্যা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০১
কবিতা ॥ বরাকরের সন্ধ্যা। বুদ্ধদেব ঘটক ৩০৯
একটি চিন্তা। সন্তোষ চক্রবর্তী ৩১০
আলোচনা ॥ ছোট গল্পের সংকট। হরেন ঘোষ ৩১১
সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ ॥ সাধারণ রঙ্গালয়। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩১৩
সমালোচনা ॥ বিদেশ বিভুঁই। রাণা বসু ৩১৫
আজকের পশ্চিম। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৩১৬
সামনে চড়াই। মঞ্জুলিকা বসু ৩১৭

সম্পাদক
আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

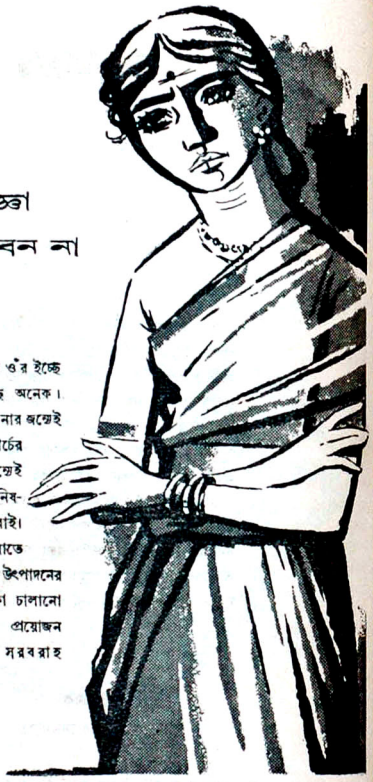

...ওঁকে অবজ্ঞা করবেন না

সাধারণ একজন গৃহকর্ত্রী...কিন্তু ওঁর ইচ্ছে অনিচ্ছের মূল্য আমাদের কাছে অনেক। ওঁর কি প্রয়োজন শুধু এইটুকু জানার জন্যেই আমরা সারা দেশে মার্কেট রিসার্চের কাজ পরিচালনা করি। সেইজন্যেই হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষ-পত্রের মান নির্নয় করছেন গৃহকর্ত্রীরাই। এই জিনিষগুলির গুণাগুণের যাতে কোন তারতম্য না ঘটে সেইজন্যে উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে নানাধরনের পরীক্ষা চালানো হয়। তাই আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ভাল জিনিষপত্র সরবরাহ করতে সক্ষম।

দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

HLL. 15-X52 BG

কলমের স্বাধীনতা ও মিল্টন

মুরারি ঘোষ

অনেকেই বলেন, কবিরা রাজনীতি থেকে সকল সময়ে দূরে সরে থাকবে, রাজনীতির জটিল আবর্তে ছোটবড় তরংগ তোলার বাসনা যেন তাঁদের না হয়। রাজনীতির সংগ্রামে কবিদের খুব উঁচুস্থান না থাকলেও দেখা গেছে অনেক কবি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, রাজনীতির দ্বন্দ্বের গভীর-ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন এবং অনেক কবির জীবনে এক বৃহত্তর অভিজ্ঞতার পাঠ সাঙ্গ হয়েছে এই রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। তাঁদের সৃষ্টিশীল মানসে এ অভিজ্ঞতার রসায়ণ সকল সময়ে বুঝাই গেছে কিনা তা সমালোচকের দৃষ্টিভংগিতে বিচার না করে কবিদের জীবনের ব্যক্তিগত রুচি ও আকাঙ্খার উপর নিঃসন্দেহেই আমরা ছেড়ে দিতে পারি। পৃথিবীর সেরা সাহিত্যিক-দের মধ্যে এমন জন খুব কমই আছেন যিনি, যিনি তাঁর সমকালীন রাজনীতির ঘোলাজল একবারও গড়ুষবন্ধ করেন নি। মিল্টনের জীবনের কুড়িটা শ্রেষ্ঠ বছর রাজনীতির তুমুল আবর্তে পাক খেয়ে ফিরেছে এক অসম্ভব সামাজিক—রাজনৈতিক বাদবিতন্ডায় এই কবি শ্রেষ্ঠ তাঁর তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের (১৬৪১ থেকে ১৬৬০ খৃঃ) যৌবনতপ্ত মুহূর্তগুলো কাটিয়েছেন। রাজ-নীতির সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ কিছুই হারান নি এক 'নাইটহুড' ছাড়া। ভিক্টর হুগো ফরাসী পার্লামেন্টের কাছ থেকে যে অভূতপূর্ব সম্মান আদায় করেছেন তা কোন দেশের সাহিত্যিক কোনদিন নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই লাভ করেন নি। আর মিল্টনকে বৃটিশ পার্লামেন্ট এক উপাধি উপহার দিয়েছিলেন।

One of the transgressors of law.

তৃতীয় নেপোলিয়নের বিরোধিতা করে ভিক্টর হুগোর লাভ হয়েছিল এক দীর্ঘ পলাতক জীবন। ১৮৫১ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত। মিল্টনকে অবশ্য কোন পলাতক জীবন যাপন করতে হয় নি। ইংলন্ডের বিপ্লবে (১৬৪২) এ অবস্থা কারুর ভাগ্যেই ঘটেনি। দুই দেশের দুই বৈপ্লবিক পরিবেশে মিল্টন ও ভিক্টর হুগোর জীবন তুলনীয়। জীবনের সুরু থেকে রাজশক্তির বিরোধিতা করাই ভিক্টর হুগোর বাসনা ছিল না। প্রথম যুগে গণতন্ত্রকে সমর্থন করলেও রাজশক্তির নিরাসন তিনি চান নি। অনেকটা গ্রেট বৃটেনের অনুসরণে রাজশক্তির কার্যকারিতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু রাজশক্তির একাধিপতাই তার এই বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানলো। রাজকীয় সেন্সরে তাঁর দুটো নাটক। বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়েছিল। লেখক-রাজনীতিবীদ শাতোব্রিয়াকেই হুগো তাঁর জীবনের আদর্শ হিসেবে ধরেছিলেন। শেষ জীবনে তিনি ফরাসী

সিনেটের নির্বাচিত কবি সদস্য। বিদ্রোহ শেষে তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্ব অন্তে ফরাসী জনতা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো আবার। কবি ভিক্টর হুগোর পলাতক জীবন তখন শেষ। গণতন্ত্রের মহাকবি হিসেবে প্রচুর সম্মান তিনি পেলেন। যেদিন তাঁর ৮০ বছর পূর্ণ হোল সেদিন প্যারি নগরী উৎসবে উন্মত্ত। সিনেটে যা অভ্যর্থনার আয়োজন হোল কোন দেশের রাজ্য পরিষদে তা কদাচিৎ হয়েছে। শিল্পীসাহিত্যিকেরা এতটা সম্মান গণ-প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পাননি কোথাও।

রাজশক্তির বিরোধিতা করে ভিক্টর হুগো যে সম্মান পেয়েছেন মিল্টন তার এক কণাও পান নি। পার্লামেন্টের সদস্য না হলেও হুগোর মতই ইংলণ্ডের গণতন্ত্রের লড়াইয়ে তিনি অন্যতম সংগ্রামী। হুগোর পূর্বসাধক। মিল্টন ইংলণ্ডের প্রথম ও শেষ সাহিত্যিক যিনি রাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চেয়েছিলেন। গণতন্ত্রের লড়াইয়ের চরম মুহূর্তে রাজার ছিন্নশির দাবী করায় তিনি পিছিয়েও যাননি। যে ষাটজন পার্লামেন্টের সদস্য রাজার মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর দিয়েছিলেন মিল্টন তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। এমন কথাও তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে প্রয়োজন হলে রাজার মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর দানে তিনি কুণ্ঠিত নন।

কোনো কোনো সমালোচক দুঃখ করেছেন রাজনীতির এত গভীরে, এত খুঁটি নাটির মধ্যে মিল্টনের প্রবেশ করা উচিত হয়নি। স্যার রিচার্ড জেব * বলেছেন মিল্টনের ৩০ থেকে ৫০ বছর বয়স কাল 'প্রায় শূন্য গর্ভযুগ'। মিল্টন যে সময়ে রাজনীতির আগুনের ঝাঁপিয়ে পড়েন সপ্তদশ শতাব্দীর সেই কুড়ি বছরে (১৬৪০-১৬৬০) ইংলণ্ডের কোনো সাহিত্যিক রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন নি। ইংলণ্ডের সাহিত্যজগৎ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ হাতিয়ার না হলেও বিপ্লবের পরিবেশ রচনায় বিশেষ কার্যকরী ছিল। সেন্সরশিপের যথেষ্ট কড়া বাধুনি থাকা সত্ত্বেও এই বিক্ষুব্ধ যুগের সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মসংক্রান্ত মতবাদ ও মতভেদ নিয়ে যে সমস্ত প্রচুর সাহিত্য রচিত হয়েছে তার সংখ্যা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। 'জর্জ টমাসন' নামে এক বই বিক্রেতা ১৬৩৮ সাল থেকে ১৬৬২ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডে প্রকাশিত ধর্ম ও রাজনীতি সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত আইনী বেআইনী বই সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। ২৪ বছরের এই সংগ্রহ প্রায় তেইশ হাজারের কাছাকাছি **। এই সংগ্রহের মধ্যে মিল্টনের ১১টি রচনা আছে। এগুলো মিল্টনের উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা, যাদের প্রায় সবকটাই রাজকীয় লাইসেন্স বিনা বে-আইনীভাবে ছাপানো ও প্রকাশিত। এ সব রচনার অধিকাংশের প্রকাশক মিল্টন নিজেই। আইনসংগত ভাবে এসব রচনার প্রকাশক পাওয়া তখন দুর্ঘট ছিল। বিশেষ করে, মিল্টন তাঁর প্রথম দিকের দু'একটি বেআইনী রচনা নিজেই প্রকাশ করে সরকার অনুমোদিত প্রকাশক স্টেশনার্স কোম্পানীর কুনজরে পড়েন, এই সমস্ত রচনার মধ্যে দিয়েই রাজনীতির উত্তপ্ত আসরে মিল্টনের প্রবেশ লাভ।

বিবাহ বিচ্ছেদ, ধর্মের গোড়াপাট, চার্চের একাধিপত্য সংকোচন, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রসঙ্গ, রাজশক্তির উচ্ছেদ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা—এই ছিল তাঁর গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু। মিল্টনের এই সৃষ্টির যুগকে শূন্য গর্ভ বলা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। অবশ্য মিল্টনের আলোচ্য বিষয়ের একটানা এক তালিকা তুলে দিলেও তাঁর রাজনৈতিক সৃষ্টি-সম্ভারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝানো যাবে না। বিশেষ করে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার দাবিতে অপূর্ব সৃষ্টি 'অ্যারিওপ্যাজিটিকা', আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল্যবান দলিল, 'দি টেনিওর অফ কিঙস্ অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেটস্' কিংবা ধর্ম সংস্কারের ভূমিকা স্বরূপ, 'ডি ডক্ট্রিনা ক্রিশিয়ানা' মিল্টনের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি।

1. HERNANI. 2. Le Roi S' Amuse.

* Areopagitica, a commentary. Sir Richard Jebb. * * Old Booksellers. Knight.

সমালোচকেরা কেউ কেউ অপছন্দ করলেও মিল্টনের শেষ জীবনের গভীর প্রশান্তি এই যৌবন কালের রাজনৈতিক সংগ্রাম। ভিক্টর হুগোর মত রাজকীয় সম্মান লাভ না করলেও মিল্টনের দুর্যর আত্মপ্রসাদে কোন সমালোচক নিশ্চয়ই আঘাত দিতে পারবে না। ডগলাস বুশ বলছেন : মুক্তির যে যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং যাতে সমস্ত য়ুরোপ পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল বলেই তার ধারণা, সেই স্মৃতি তাঁর দৃষ্টিহীন জীবনে অশেষ সান্ত্বনার কারণ হয়েছিল।

রাজনৈতিক নেতা হবার বাসনা পোষণ করতেন মিল্টন। রাজনৈতিক নেতা না হতে পারলেও পৃথিবীর অনেক সাহিত্যিকের মনে এ বাসনা এক এক সময়ে প্রবল হয়ে ওঠে। মিল্টন তখন দক্ষিণ য়ুরোপে ভ্রমণ করছেন (১৬৩৮) যখন ইংলণ্ডের বিক্ষুব্ধ সংবাদ য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়লো। 'ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত' মুক্তগতি ভ্রমণে তাঁর ইচ্ছা রইল না। কিছুদিনবাদে তিনি ফিরে এলেন লণ্ডনে। দূরে বসে বাঁশী বাজানোর স্বপ্ন শেষ করে এসেছেন, বলছেন, :

I thought it base to be travelling for amusement abroad, while my fellow citizens were fighting for liberty at home. (Defensio Secunda)

অবশ্য ইংলণ্ডে ফিরে এসে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করেছিলেন। ১৬৪১ সালে তাঁর বই বেরুল : 'অফ রিফর্মেশন ইন ইংলণ্ড'। ধর্মসংক্রান্ত সবচেয়ে বিতর্কমূলক বাদবিতণ্ডায় প্রবেশ করলেন তিনি। এ বই যখন প্রকাশ পেল ধর্মের প্রধান পুরুষেরা অনেকেই ক্ষুব্ধ হলেন। ১৬৩৭ সালের লাইসেন্সিং অ্যাক্ট অনুসারে এ বই বে-আইনী করে দেওয়া যেত। কিন্তু '৪১ সালে রাজার প্রধান ক্ষিয় পরিষদ 'স্টার চেম্বার' তখন ক্ষমতাহীন প্রতিষ্ঠান মাত্র। লং পার্লামেন্টের বিরুপতায় স্টেশনার্স কোম্পানীর মনোপলি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল বেশ কয়েক বছরের জন্যে। '৩৭ সালের আইন অনুযায়ী লণ্ডনের মোট কুড়িটা প্রতিষ্ঠান মুদ্রাযন্ত্র রাখার অধিকার পেয়েছিল। এদের সমবায় হল স্টেশনার্স কোম্পানী। এদের সংগে অবশ্য অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বই ছাপার অধিকার পেয়েছিল। সম্রাটের নিজের এক স্বতন্ত্র প্রকাশালয় ছিল। ছাপার অধিকার এদের থাকলেও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কারুর ছিল না। লাইসেন্সিং অ্যাক্টে ক্ষমতা ভাগ করা। বই ছাপার আগে অনুমোদন দরকার। আইনের বই দেখবেন লর্ড চীফ জাস্টিস ও লর্ড চীফ ব্যারণ। ইতিহাস ও শাসন সংক্রান্ত বই দেখবেন প্রধান সেক্রেটারি অব স্টেট্। যুদ্ধের বই দেখবেন আর্লমার্শাল, আর বাকী যাবতীয় বই পরীক্ষা করবেন ক্যান্টার বেরীর আর্চবিশপ ও লণ্ডনের বিশপ। স্টেশনার্স কোম্পানীকে এমন ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল যে বে-আইনী বইয়ের খোঁজে তারা বিভিন্ন লোকন ঘর এমন কি নাগরিকদের ঘরবাড়ীও তল্লাশ করতে পারবে।

স্বাধীন চিন্তা যে কতখানি তৎপর হয়েছিল ইংলণ্ডে ১৬৪১ সালেই তা দেখা গেল। পার্লামেন্টের সামান্যতম ইংগিতে ইংলণ্ডের শহরে শহরে ছাপাখানা বসে গেল। লেখক, প্রকাশক, নীতিবাগীশ, রাজনীতিবিদ কোন অন্ধকার কোণে যেন অপেক্ষা করেছিল। সবাই কলম বাগিয়ে ছুটে এল। এক আশ্চর্য কলমের লড়াই সুরু হল। সবচেয়ে জটিল হল ধর্মসংস্কার নিয়ে বাগ্‌যুদ্ধ। জটিল হয়ে উঠল তার প্রধান কারণ হলেন মিল্টন। পাণ্ডিত্য আর সূক্ষ্ম কলমের ধার নিয়ে তিনি আসরে অবতীর্ণ হলেন। সমাজ, পরিবার, রাজনীতি সমস্ত বিষয়ে তখন ধর্মের ধরদারি। এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক অস্থির জিজ্ঞাসা স্পষ্ট হয়ে উঠছে সবখানে। ধর্মের আধিপত্যের বিরোধিতা করে মিল্টন এক বছরের মধ্যে পাঁচটা রচনা প্রকাশ করেন। ১৬৪২ এ বিস্ফোরণ সুরু হল। গোটা কুড়ি বছর ইংলণ্ডের ইতিহাস স্থিতিশীলতা হারিয়ে ফেলে। ইতিহাসের স্থায়ীরূপ সন্ধানে ইংলণ্ডের সমাজ মানসে তখন তুমুল ওঠা পড়া। এই বিক্ষোভের কৃষ্ণি নায়ক হলেন মিল্টন, কেননা মিল্টনের মত গভীর সুরে কেউ বলতে পারেন নি :

I determined to relinquish the other pursuits in which I was engaged, and to transfer the whole force of my talents and my industry to this one important object (i.e. the vindication of liberty).

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষকালে মিল্টন হলেন তার অন্যতম অগ্রপ্রতীক। স্বাতন্ত্র্যের কোন আদর্শ তখন জনতার সামনে উন্মোচিত হয়নি। কিন্তু রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পীড়নে, ধর্মের অনুশাসনে তখন ইংলন্ডের উদীয়মান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনে ধূমায়মান বিক্ষোভ। সেই স্বাধীন ভাবনা ও কর্মের অস্পষ্ট কামনার মুদ্রিত রূপ হল মিল্টনের মন। চার্চের সঙ্গে বিতর্কে যখন মিল্টনের গভীর মনোযোগ সেই মুহূর্তেও মিল্টনের নিজের মনের দ্বন্দ্ব পরিষ্কার ছিল না। গদ্য রচনায় মিল্টন প্রথম কলম ধরলেন তখন আমরা দার্শনিক মিল্টনকে পেলুম না পেলুম এক নিখুঁত 'প্রপাগান্ডিস্ট'কে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রচারক। ধর্মের অনুশাসনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সামান্যতম খর্বতায় তাঁর প্রচন্ড প্রতিবাদ। এ সমস্ত 'প্রপাগান্ডার' বিষয়বস্তুতেই পান্ডিত্যের উপাদান, যুক্তির আভিজাত্য, বিরোধিপক্ষের মতবাদ খন্ডন নিখুঁত ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। হয়তো নিছক প্রচার সাহিত্য বলেই আজকের যুগে এ সমস্ত রচনার শক্তি অনুপলব্ধ। তবু যে রচনার কথা পৃথিবী চিরকাল মনে রাখবে, যে রচনার বিষয়বস্তু ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃতিজগতের গৌরবময় ইতিহাস তা হল মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাজিটিকা' (১৬৪৪)।

একান্ত ব্যক্তিগত দুঃখেই মিল্টন রচনা করেছিলেন, 'দি ডক্ট্রিন অ্যান্ড ডিসিপ্লিন অব ডাইভোর্স' (১৬৪৩)। বিবাহিতা স্ত্রীর প্রত্যাখ্যান তাঁকে এই মূল্যবান দলিল রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতির মত এ রচনা। তখন ইংলন্ডে সেন্সার শিপের ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে—তবু পার্লামেন্ট নতুন আইন জারী করে স্টেশনার্স কোম্পানীর মনোপলির নতুন স্বীকৃতি দিল। ঠিক এই মুহূর্তে মিল্টন প্রকাশ করলেন বিবাহ বিচ্ছেদের রচনা লেখক মুদ্রাকরের নাম গোপন রেখে। নাম না ছাপা হলেও মিল্টন গোপন রইলেন না। এই ধর্মবিরোধী রচনার বিরুদ্ধে অনেকেই কলম ধরলেন। বিতর্কের উত্তেজনায় স্বমত সমর্থনে মিল্টন আরো তিনটে রচনা আইন অমান্য করে প্রকাশ করলেন। মিল্টনকে শাস্তিদানের অনুরোধ জানিয়ে স্টেশনার্স কোম্পানী আবেদন পাঠালো পার্লামেন্টে। পার্লামেন্ট মিল্টনের ব্যাপারে গুরুত্ব দিল না। কিন্তু মিল্টন স্টেশনার্স কোম্পানীর আচরণে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন। ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরুদ্ধে এতটুকু আঘাত তিনি সহ্য করতে প্রস্তুত নন। ধর্ম সম্পর্কিত প্রথম দিককার বিতর্কমূলক রচনায় তিনি ঘোষণা করে রেখেছিলেন :

For me I have determined to lay up as the best treasure of a good old age, if God vouchsafe it me, the honest liberty of a free speech from my youth.

গ্রীক পুরাণের ক্যাডমাস ড্রাগন হত্যা করে তার দাত পুঁতে দিয়েছিল মাটিতে। সেই দাঁত থেকে জন্ম নিল হাজার হাজার সশস্ত্র সৈন্য। জন্মের কিছুকাল পরেই তাদের মধ্যে লড়াই লেগে গেল। বেশ কিছু সৈন্য মারা পড়ল। যারা বেঁচে গেল তাদের নিয়ে ক্যাডমাস এক সুন্দর সহর স্থাপনা করলেন। মিল্টন বলছেন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ক্যাডমাসের দাঁত পুঁতে দেওয়ার মত ব্যাপার। অঢেল স্বাধীনতার সুযোগে সৃষ্টিবৈচিত্রের মধ্যে সৎ সৃষ্টিই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে। শুধু তাই নয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অন্যসমস্ত স্বাধীনতাকেও রক্ষা করবে। যখন বিপ্লব সুরু হল তখন ইংলন্ডের আকাশে নানারকমের স্বাধীনতার ধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছে। নাগরিক স্বাধীনতা, উপাসনার স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, স্বাধীনতার সীমাহীন দাবীতে ইংরেজ-জনমানস উদ্বুদ্ধ। আর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার মধ্যে সামগ্রিক

জীবন সত্যপথে পরিচালনা করার দায়িত্ব খুঁজে পেলেন মিল্টন। কোন সাধারণ জীবনের চেয়ে বিশেষ এক বইয়ের মূল্য সব সময়েই বেশী। তিনি বললেন, :

......who kills a man kills a reasonable creature, God's image, but he who destroys a good book, kills reason itself, kills the image of God, as it were, in the eye. (Areopagitica).

'মুদ্রণের অবাধ স্বাধীনতার জন্য ইংলন্ডের পার্লামেন্টের নিকট মিল্টনের বক্তব্য'—এই হল অ্যারিপ্যাজিটিকার সাবটাইটল্। তাঁর এই বক্তব্য গ্রীক 'ওরেটরীর' ঢঙে। অজস্র যুক্তি, ইতিহাস আর পুরাণের উদাহরণ দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন এই অনুপম গদ্যরচনা। মিল্টনের কাব্য মিল্টনের গদ্যের জৌলুস হয়তো কমিয়ে দিয়েছে। গদ্যের চেয়ে মিল্টনের কাব্যরচনাই অধিকতর পঠিত। তবু 'প্যারাডাইস লস্টের' গুরুত্ব না কমিয়েও গ্রীয়ারসন্ যা বলেন নিশ্চয়ইতা অসমর্থন যোগ্য নয়। গ্রীয়ারসন বলেছেন, : Milton was more truly a prophet in his early prose than in ris poems. (A Milton handbook).

'আরিওপ্যাগোস' ছিল এথেন্সের প্রধান নগর বিচারালয়। পক্ষপাতহীন বিচারব্যবস্থায় 'আরিওপ্যাগোসের' সুনাম দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদেশী বাদী-প্রতিবাদীর অনেক ঝগড়ার মীমাংসাও করতে হয়েছে 'অ্যারিও প্যাগোস'কে। এথেন্সের সাহিত্য সেন্সর করার ক্ষমতাও ছিল এই বিচারালয়ের। কালক্রমে 'অ্যারিও প্যাগোসে'র ক্ষমতা যখন কমে আসে গ্রীক বক্তা 'আইসোক্রেটস, বই লিখলেন 'অ্যারিও প্যাজিটিকাস' নামে। এই বইতে তিনি 'আরিওপ্যাগোসের' পক্ষে অনেক ওকালতী করলেন। কলমের অবাধ স্বাধীনতার ওপর সেন্সর করার ব্যবস্থা ক্ষমতা অর্পণ করতে চাইলেন এই বিচারালয়ের ওপর। কিন্তু মিল্টন কলম ধরলেন ঠিক উল্টোমুখে। কলমের অবাধ স্বাধীনতাই প্রয়োজন। সেন্সর করার বিরুদ্ধেই তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা। ইতিহাসের স্পর্শ রাখার জন্যে আইসোক্রেটসের অনুকরণে তাঁর বক্তব্যের নামকরণ হল 'অ্যারিও প্যাজিটিকা'। 'ডিফেন্সিয়ো সেকোন্ডা' রচনায় মিল্টন বলেছেন :

......I am bringing back, bringing hope to every nation, liberty, so long driven out, so long exile, ...that I am importing fruits for the nations, from my own city, but of a nobler kind than those fruits of cares, that I am speeding abroad among the cities, the kingdoms, and nations and the restored culture of citizenship and freedom of life.

এই উচ্চকণ্ঠ বক্তব্যের বিশেষ প্রতিক্রিয়া ইংলন্ডের সাহিত্য সমাজে দেখা যাবে। উনিশ শতকের ইংলন্ডে মিল্টনের ভক্ত সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের পর নতুন সমাজ ও ব্যক্তি চেতনার আলোকে ইংলন্ডের কবি মহলে মিল্টনের প্রভাব পড়েছিল সবচেয়ে বেশী। মিল্টনের জীবনদর্শনের প্রগতিশীলতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন শেলী ও বায়রণ। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মানব মুক্তির আদর্শ ছিলেন মিল্টন। মিল্টন যখন বলছেন, 'দেশে দেশে মুক্তির বার্তা তিনি বয়ে নিয়ে যাবেন'—এ কেবল তাঁর উচ্চাকাঙ্খা নয় সফল-স্বপ্নও বটে। ফরাসী বিপ্লবের উদ্যোক্তারাও মিল্টনকে স্মরণ করেছিলেন। মিল্টনের বক্তব্যের গাম্ভীর্য, যুক্তির কাঠিন্য, ইতিহাস চেতনার প্রখরতা ও সর্বাত্মক মানবমুক্তির আদর্শ হিউম্যানিস্টরা যুগে যুগে স্মরণ করবে। বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে কলমের স্বাধীনতার জন্যে যখন বিবৃতির প্রয়োজন হল 'মিরাবো' তখন নিজের সুরে বক্তব্য তৈরী করলেন না। 'অ্যারিও প্যাজিটিকার' সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করে দিলেন। অথচ 'আরিও প্যাজিটিকার' স্বাধীন বক্তব্য ক্রমওয়েলেরও পছন্দ হয়নি। এ বই প্রকাশের কয়েক

সপ্তাহবাদেই পার্লামেন্ট থেকে মিল্টনকে অভিহিত করা হল 'কুখ্যাত আইন ভঙ্গকারী' বলে।

যেদিন ইংলণ্ডে কলমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হল, সেদিন 'অ্যারিও প্যাজিটিকা' প্রকাশ কাল নয়। আরো পঞ্চাশ বছর বাদে সেই শতাব্দীর দ্বিতীয় বিপ্লবে (১৬৮৮) ইংলণ্ডে আধুনিক গণতন্ত্রের উষালোক উন্মোচিত হল। ফরাসী বিপ্লবের একশো বছর আগে পৃথিবীর সর্বাত্মক গণতন্ত্রের ভূমিকা রচনা হয়েছে ইংলণ্ডের ভূমিতেই। কিন্তু মিল্টনের রচনা বোধহয় সেদিনের ইংলণ্ড ভুলে গিয়েছিল। না হলে 'চার্লস রাউন্টে'র চুরি সেদিন ধরা পড়েনি। এক অখ্যাত লেখক ' চার্লস রাউন্ট' লাইসেন্সিং অ্যাক্টের বিরুদ্ধে দু দুটো বই প্রকাশ করলেন (১৬৯৩)। এ দুটো বইয়ের সব কিছুই প্রায় 'অ্যারিওপ্যাজিটিকা' থেকে তুলে নেওয়া। বই দুটির নাম ঃ

1. A Just Vindication of Learning and Liberty of the Press.
2. Reason for the Liberty of the Unlicensed Printing.

মিল্টনের যুক্তি, মিল্টনের ভাষা পাতার পর পাতা সাজিয়ে রাউন্ট বই লিখলেন কিন্তু মিল্টনের নামোচ্চারণ করলেন না একবারও। এ বই পার্লামেন্টে পাঠানো হল। মিল্টনকে না পড়লেও রাউন্টকে পড়লো ইংলণ্ডের লোক। মুদ্রাকর, বই বিক্রেতারা পার্লামেন্টে আবেদনের পর আবেদন পাঠাতে লাগলো। অবাধ মুদ্রণ অধিকার চাই। ফলে, ১৬৯৫ সালে পার্লামেন্ট লাইসেন্সিং অ্যাক্টের নতুন করে অনুমোদন দিল না। ইংলণ্ডে মুদ্রনের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হল। এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তের ইতিহাস কী শান্ত, নিরীহ পরিবেশে তার যবনিকা উত্তোলন করলো। ইংলণ্ডের এই সিদ্ধান্ত উত্তরকালে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই প্রেরণা দিয়েছে। এই মুক্তি-কাহিনীর বিবরণ লর্ড মেকলে এই ভাবে দিয়েছেন, ঃ

.....a vote which at the time attracted little attention, which produced no excitement, which have been lifted unnoticed by volluminous annalists, and of which the history can be imperfectly traced in the archives of Parliament, but which has done more for liberty and for civilization than the GREAT CHARTER or the BILL of RIGHTS.

ভিক্টর হুগোর সংগে মিল্টনের জীবনের যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়, স্থানকালপাত্র বিভিন্ন হলেও তার এক তুলনামূলক ইতিহাস খাড়া করা চলে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মুহূর্তে হুগো দেশবাসীর কাছে মহান নেতারূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু মিল্টনের সবচেয়ে বড় খুঁত হল তিনি যতবড় সাহিত্যিক, যতবড় দার্শনিক ততবড় রাজনীতিক নন, অন্তত প্রচলিত অর্থে। তুলনাহীন মানব পরিবেশে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির বিকাশ, সফল রাজনীতির বাস্তব প্রবাহে তিনি গা ভাসিয়ে দিতে পারেন নি। রাজনৈতিক স্বচ্ছতা না থাক, তাঁর ছিল অতুলনীয় দূরদৃষ্টি। এই দূরদৃষ্টির ফল, 'দি ডকট্রিন অ্যাণ্ড ডিসিপ্লিন অব ডাইভোর্স' এবং 'অ্যারিও প্যাজিটিকা'।

প্রচণ্ড দার্শনিকতা নিয়ে মিল্টনের রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ লাভ। এই পাণ্ডিত্য আর দার্শনিকতার সংগে সচল রাজনীতির গতিলীকা প্রবাহের কোন স্থায়ী চুক্তি চলে না। রাজনীতি আর পাণ্ডিত্য যেখানে মিলিত হয় সেখানে জন্ম হয় সার্থক সমাজবিজ্ঞানের। মিল্টন কোন সমাজ-বিজ্ঞানের প্রবক্তা ছিলেন না। তবু সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে হুগোর মত সাফল্য লাভ না ঘটলেও রাজনৈতিক ইতিহাসের পাদটীকায় তাঁর স্থান নয়—ইতিহাসেরই তিনি অন্যতম নির্মাতা। স্মরণ রাখা দরকার কলমের স্বাধীনতার জন্যে মিল্টনের যে লড়াই 'মেকলের মতে তার সুফল ইংলণ্ডের 'গ্রেট চার্টার' বা 'বিল অব রাইট্‌সের' থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

সানাই

সোমেন বসু

১৩৪৭ সালের আষাঢ় মাসে 'সানাই' প্রকাশিত হলো। 'সানাই'য়ের কবিতাগুলি প্রায় দুবছর ধরে লেখা কবিতাগুচ্ছের একটি অংশ। অপর অংশের কবিতাগুলি 'নবজাতকে' বেরুলো। দুটি কাব্যের কবিতা আলাদা জাতের। 'নবজাতকে'র কবিতাগুলিকে তিনি নিজে প্রৌঢ় ঋতুর ফসল বলেছিলেন—মননজাত অভিজ্ঞতায় তাদের জন্ম। সেখানে ইতিহাসের চেতনা প্রবল, আন্তর্জাতিক ঘাত-প্রতিঘাতের সংগ্রামে কবি বিক্ষুব্ধ। বর্তমান সভ্যতার বহুবিধ দুর্বলতা তাঁকে চিন্তিত করেছে। 'সানাই'য়ে এসব কথা প্রায় নেই। এখানে জীবনের অন্যান্য উপলব্ধি আছে, প্রেমের কবিতা আছে—নবজাতকের কোন অভ্যর্থনা নেই, হিন্দুস্থান রাজপুতানার পরিণতি সম্বন্ধে কোন খেদোক্তি নেই, বুদ্ধভক্ত ও প্রায়শ্চিত্তের মত বিক্ষুব্ধ প্রকাশ নেই, রেলগাড়ী, এপার ওপার, জন্মদিন, ইষ্টেশন জাতীয় দার্শনিক চিন্তার কথা নেই। নিজের অতীতের কথা স্মরণ করে রোমান্টিক মনের খুসী প্রকাশ করেছেন। প্রেমের কবিতা ও গানের সুর যৌবনকালের কাব্যের মত বর্ণবহুল না হলেও বেদনাকে সহজে স্বীকার করে শুদ্র হয়ে উঠেছে।

তিনি যে জন্ম-রোমান্টিক একথা আর একবার সগৌরবে সানাইয়ের কবিতায় বলেছেন। রুঢ় ভাবে এই সংসারের সীমার বাইরে যাবার জন্যে তাঁর কল্পনার বিচিত্র প্রয়াস লক্ষ করেছি। যে অর্থটা চলে আসছে কোন কাজে বা কথায় তার বাইরে যাবার মত মন আছে কজনের! কবির মনে কিন্তু সেই চেষ্টাই নিরন্তর। যা স্থূল, যাকে চোখে দেখা যাচ্ছে, যাকে মুঠো করে ধরা যাচ্ছে সেই কি শেষ? তাহলে সানাইয়ের সুরের চেয়ে তো ভোজের উচ্ছিষ্টাবশেষ সত্য হয়ে ওঠে। রোমান্টিক কবির বেদনা তাই তাঁর নিজের সৃষ্ট পুরুষের বেদনার মত—

"পুরুষের অনন্ত বেদনা মর্তের মদিরা মাঝে স্বর্গের সুধার অন্বেষণ।"

এই সুরকে প্রকাশ করার জন্যে রবীন্দ্রনাথ যে ভঙ্গী নিয়েছেন তা খুব অলঙ্কারবহুল নয় অথচ যাঁরা রবীন্দ্র-ভাব মণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের কাছে খুব সহজবোধ্য নয় সেই সব কথা। যেমন 'পাই তারে না-পাওয়ার রূপে', 'সত্য যা পাই ক্ষণেকের তরে ক্ষণিক নহে', 'চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে অজানার অতিদূর পারে'—সবই আছে তবে সাদা চোখে দেখা যাচ্ছে না যে সব আছে; তাই তাদের খুঁজে নিতে হবে। এই খুঁজে নেওয়ার সাধনাই রোমান্টিক কবির সাধনা। যেমন প্রেমের কবিতাগুলিতে তিনি এমন প্রেমিক বা প্রেমিকার কথা বলছেন যে তার প্রেমের স্বীকৃতি পায় নি। কিন্তু সে ভেঙ্গে পড়েনি, সে তার ভালবাসার লোককে অভিশাপ দেয়নি। মনের ভিতর তার আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জাগেনি, সে অত্যন্ত শান্তভাবে অত্যন্ত ধৈর্য-সহকারে নিজের বিচ্ছেদের মধ্যে, নিজের বেদনার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজছে। একটি অত্যন্ত উচ্চগ্রামে বাঁধা প্রেমিক চিত্তের ধারণা কবি করেছেন—সে প্রেমিক ভদ্র, শক্তিশালী, আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন এবং সবচেয়ে বড় কথা নিজের প্রেম সম্বন্ধে যার কোন আত্মধিক্কার নেই। যৌবনের উচ্ছল দীপ্তির যে প্রকাশ দেখেছি কবির জীবনে এই দৃষ্টিভঙ্গী সে জাতের নয়। এই অবস্থা তত উজ্জ্বল নয়, তত বর্ণচাতুর্য এর মধ্যে প্রকাশ পায়নি কিন্তু এর শান্তি এর সৌন্দর্য অনেক ধীর স্থির অনেক গভীর। 'তোমাতে আমাতে বাঁধিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে' এই পর্বের কথা নয়—এখানে বলছেন 'যদি এ মাটিতে চলিতে চলিতে পড়িত তোমার দান, এ মাটি লভিত প্রাণ'। পুরানো দিনের সঙ্গে সুরের পার্থক্য সহজেই অনুভব করা যাচ্ছে।

কবির শেষ জীবনের সকলকাব্যেই একটি বিদায় বেদনার সুর ধ্বনিত হচ্ছে। যত চলেছেন পশ্চিমের দিকে, পূর্বাচলের ডাক ততই করুণ হয়ে উঠছে। পিছনে ফেলে আসা যে জীবন তার নানা রং নানা সুর বিশেষ করে মনে পড়ছে। এও রোমান্টিক মনের আর একটি প্রকাশ। কালের দিক থেকে কবি দূরসন্ধানী হয়েছেন, তাই মন চলে গেছে কোন সুদূরে। তবে 'পূরবী'র কবিতায় এই সুর যেমন স্পষ্টতই অতীতবিচরণের, 'সানাই'য়ে তা তত স্পষ্ট নয়। এখানে 'পূরবী' 'বকুলবনের পাখী' জাতীয় কবিতা নেই। কয়েকটিতে মাত্র পুরানো দিনের কথা মনে করেছেন। যেমন 'মানসী' কবিতায় বলতে চেয়েছেন যে আমাদের সৃষ্টির সঙ্গে তার জন্মমুহূর্তের সম্পর্ক বড় কম। তাই তাঁর পদ্মাতীরে লেখা কবিতাগুলি মনে পড়লো। সেই সঙ্গে পদ্মাবক্ষের সেই দিনগুলি কবির মনে ভেসে এলো—

মনে নেই, বুঝি হবে অগ্রহায়ণ মাস
তখন তরণীবাস
ছিল মোর পদ্মাবক্ষ পরে।
* * *
ওপারেতে আকাশের প্রশান্ত প্রণতি
নেমেছে মন্দির চূড়া পরে।
হেথা হোথা পলিমাটিস্তরে
পাড়ির নিচের তলে
ছোলা ক্ষেত ভরেছে ফসলে।
অরণ্যে নিবিড় গ্রাম নীলিমার নিম্নান্তের পটে;
বাঁধা মোর নৌকাখানি জনশূন্য বালুকার তটে।

এ কবিতা শুধু অতীতের স্মৃতি রোমন্থনই নয়, এর পিছনে একটি বলবার কথা আছে। কবিতাটির জন্মলগ্ন কত মধুর ছিল সেই কথা বলতে গিয়েই কবির মন অতীতচারী হয়ে গেছে।

'নতুন রঙ' গানটিতে সেই অতীত জীবন একবার মুহূর্তের জন্য ছায়া ফেলে গেছে। এ গানও সম্পূর্ণভাবে অতীতের বিগত দিনগুলির জন্য ব্যাকুলতায় ভরা নয়। জীবনের গোধূলিতে রং যে ফিকে হয়ে আসছে এই কথাটুকুই বলা। মনের একটি বিশেষ ভাব একটি বিশেষ mood এর স্বল্প প্রকাশ এই গান। এ ধূসর জীবনের গোধূলি
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি।

আর একটি কবিতা 'মায়া'—পুরোনো দিনের কোন প্রিয়ার স্মরণে। এ কবিতাও 'পূরবী' কবিতার মত পূর্বজীবনের স্মরণোচ্ছ্বাস নয়। মনে মনে হারানো প্রিয়াকে নিয়ে যে স্বপ্নের সৃষ্টি এ অনেকটা তারই কথা। দূরে চলে যাওয়া দিনগুলি থেকে কখনো সুখের স্মৃতি কখনো বেদনার স্মৃতি মনে আসছে। সে প্রিয়া আজ কাছে নেই বলেই তাকে নিজের মনের মত করে সৃষ্টি করা যাচ্ছে 'সহজেই ডাকি সহজেই রাখি দূরে।' কিংবা 'নাই কোন ভার নাই বেদনার তাপ'। এর সঙ্গে মনে পড়ে সেক্সপীয়রের সেই কথা

By absence this good means I gain,
That I can catch her where none can watch her,
In some close corner of my brain:
There I embrace and kiss her;
And so I both enjoy and miss her.

সেই বিচ্ছেদের বিরহ এত সত্য হয়ে উঠেছে জীবনে যে আজ সেই প্রিয়া ফিরে এলেও কি আর সুর মিলবে তার সঙ্গে —
যদি জীবনের বর্তমানের তীরে
আস কভু তুমি ফিরে
স্পষ্ট আলোয় তবে
জানিনা তোমার মায়ার সঙ্গে
কায়ার কি মিল হবে।

এই প্রসঙ্গের আর একটি সার্থক কবিতা 'অসময়।' নিজের যৌবনের সেই তরুণে শ্যামলে উচ্ছল তরুণ দিনগুলি কি সবই হারিয়ে গেছে? প্রভাতের ঐশ্বর্যের কোন চিহ্নই কি সন্ধ্যালোয় থাকবেনা। শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার ভাবসমৃদ্ধি আর সংযম দুই-ই এখানে আছে। বৈকালের ফসলকাটা শূন্যক্ষেতে এসেছিল এক বুলবুলি পাখি সকালবেলার আতিথ্যের কথা মনে রেখে। কিছু না পেয়েও সে গান গেয়ে গেল কেন? সে কি জেনেছে 'যাহা গেছে সরে কোনরূপ ধরে রয়েছে বাকি।' এ কবিতার ব্যঞ্জনা হচ্ছে এই যে তরুণ জীবন বিগত হওয়ার জন্যে কবির আর কোন খেদ নেই। তিনি জেনেছেন সে দিনগুলো হারায় নি। ক্ষণিকের জন্য পেলেও তারা ক্ষণিক নয়, পরবর্তী জীবনের গোধূলির মধ্যে মধ্যদিনের আলোকোচ্ছ্বাস লুকিয়ে রইলো।

সত্য যা পাই ক্ষণেকের তরে — সকালের পাখী বিকালের গানে
ক্ষণিক নহে — এ আনন্দই বহে।

এই কটি কবিতা ছাড়া পূর্বাচলের ডাক বিশেষ শোনা যাচ্ছেনা। এগুলিতে পুরানো দিনের জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ পায়নি বরং হারানো দিন বর্তমানের মধ্যে লুকিয়ে আছে নতুন রূপে—এই সান্ত্বনাই প্রকাশ পেয়েছে। 'পূরবী'র বিদায় বেদনায় একটা মন-কেমন-করার ব্যথা ছিল—সে ব্যথা এখানে নেই। আজ বিদায় গ্রহণ সম্পর্কে তিনি এত মনস্থির করেছেন যে আজ আর বললেন না 'ইমনে সাজ বাঁশী বাজে মন যে কেমন করে।'

এমন কথা বলা যায় না যে 'সানাই' কাব্যের বক্তব্যই তাঁর জীবনের শেষ পরিণতি—আসলে সেও একটা mood মাত্র। গোধূলিবেলার মেঘের মত রং বদল হতো ক্ষণে ক্ষণে, তাই অতীতের প্রতি এই শান্ত নিরাসক্ত বেদনাজয়ী দৃষ্টিই যে কবির শেষ কথা তা নয়।

সানাই মূলতঃ প্রেমের কাব্য। মিলনের মত বিরহও প্রেমের একটা বড় অংশ। প্রেমের মিলনের দীপ্তি যেমন বিচিত্র মূর্তিতে মানুষের কাব্যে ধরা পড়ছে তেমনি বিরহের দীপ্তি ও অল্প নয়। সকল ভাষার কাব্যেই এই বিরহ প্রেমের সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। মানুষ প্রেমের মিলনকে যেমন প্রগাঢ় আনন্দের বস্তু বলে স্বীকার করে নিয়েছে তেমনি স্বীকার করেছে বিরহকে তার গভীর দুঃখ সত্ত্বেও। সেই দুঃখ তাকে সাধনার শক্তি দিয়েছে, প্রতিকূলকে অনুকূল করবার ক্ষমতা দিয়েছে। বিরহ আর বিচ্ছেদ এক নয়। বিরহের মধ্যে ব্যঞ্জনা আছে বিরহী চরিত্রের নানাভাবের। প্রাচীন অপভ্রংশ অবহট্ঠ কবিতায় রয়েছে

সো মহা কান্তা দূর দিগন্তা।
পাউস আএ চেউ চেলাএ ।।

আমার সেই কান্ত এখন দূর দিগন্তে, বর্ষা এসেছে চিত্ত চঞ্চল হয়েছে। এ কবিতায় বিচ্ছেদের দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে। প্রিয়কান্ত বর্ষার দিনে কাছে নেই তারই বেদনা। এ কবিতায় বিরহের ব্যঞ্জনা অল্প। কিন্তু এরই পাশে রামগড় পাহাড়ের 'শুতগুকা' লিপি বিরহের গভীর শান্ত বেদনার সুর এনে দেয় মনে।

শুতণুক নম দেবদশিক্যি তং কময়িথ বলনশেয়ে
দেবদিনে নম লুপদখে

সুতণুকা নামে দেবদাসীকে বারাণসীবাসী দেবদীন নামে রূপদক্ষ কামনা করেছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সে কামনা পূর্ণ হয়নি তার। এ শুধু বিচ্ছেদ নয়—আর কোনোদিনই সুতণুকাকে পাবার সম্ভাবনা নেই দেবদীনের। বিরহের সেই বেদনা এত গভীর, এত স্তব্ধ যে কোন দুঃখ, কোন উচ্ছ্বাস এখানে নিতান্ত অবান্তর। প্রেমিক চিত্তের বেদনার ব্যঞ্জনায় এ কাব্য সুন্দর। কুমার সম্ভবে তপস্যার দ্বারা পার্বতী যখন মহাদেবকে জয় করলেন তখন ছদ্মবেশী মহাদেব নিজের নিন্দা করলেন পার্বতীর কাছে। পার্বতী প্রত্যুত্তরে জানালেন যে তাঁর মন ভাবের রসে স্থিত হয়েছে—মহাদেব যদি নাও আসেন নিজের অন্তরে ভাবের যে ধ্যানমূর্তি গড়ে নিয়েছেন তারই কাছে তাঁর আছে সান্ত্বনা, 'মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্'। বৈষ্ণব কবিও বিরহকে তার শেষ পরিণতি দিয়েছেন ভাবসম্মিলনের মধ্যে। বিচ্ছেদের ব্যথায় ব্যথায় কাতর হয়ে হঠাৎ শ্রীমতী অনুভব করছেন যে মাধব তো চিরদিনই তাঁর কাছে আছেন—আছেন তাঁর ভাবের মধ্যে।

আধুনিক কালে ব্যক্তি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও অনুভূতি বিরহের পটভূমিকায় প্রকাশ পেলো হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যে। গভীর পর্যালোচনায় না গিয়েও বলা যায় যে তাঁদের কবিতায় বিরহের গভীরতম উপলব্ধির প্রকাশ নেই। বিচ্ছেদ-জনিত হাহুতাশ অত্যন্ত প্রবলভাবে আছে—তার সঙ্গে সঙ্গে মাত্রাহীন অশ্রুপাত, দীর্ঘশ্বাস, মর্মভেদী হাহাকার কাব্যের বোঝা বাড়িয়েছে। কোন সুকুমার অনুভূতি, বেদনাজয়ী মহৎ পৌরুষের কোন প্রকাশ তাঁদের কাব্যে নেই। নিতান্ত দুর্বল, নিতান্ত ভাবোদ্বেল এই প্রেম। হেমচন্দ্রের প্রেমের সব কবিতাই ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের সুরে ভরা। সে সুর এত স্থূল, এত মোটা অনুভূতির যে ভাল কাব্য তা থেকে হওয়া সম্ভব নয়। যেমন

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয়রে!
কাঁদাইতে অভাগারে কেন হেন বারে বারে
গগন মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে!
তারে ত পাবার নয় তবু কেন মনে হয়
জ্বলিল যে শোকানল কেমনে নিবাই রে!
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে।

নবীনচন্দ্রের কবিতাও এইরকমই বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও স্থূল। সীমাহীন প্রগলভতা তাঁর কোন কাব্যকেই গীতিকাব্যের মর্যাদালাভ করতে দেয়নি। তবু তাঁর কবিতা থেকে এমন একটি ভাব উধৃত করছি যেটি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার ভাবগত মিল আছে, কিন্তু রচনার পার্থক্যে তাদের মূল্য কত পৃথক। যে প্রেম মনের মধ্যে গোপনে আছে, যাকে প্রকাশ করলে দুঃখ বাড়বে প্রেয়সীর, সেই প্রেমের একটি কবিতা নবীন সেনের কাব্যে আছে। প্রেম সার্থক হয়নি, বিবাহের কোন সম্ভাবনা নেই এমন অবস্থায় বুকভরা হতাশায় প্রেমিকের কাতর আর্তনাদ 'প্রতিমা বিসর্জন' কবিতায় শোনা গেল। মনের ভিতর ভালবাসার স্রোত প্রবল হয়ে উঠছে প্রেমিক তাকে কেবলই গোপন করতে চায়। কিন্তু প্রথমাংশের এই বলিষ্ঠ সুর শেষ পর্যন্ত রইলো না, ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় প্রেমিক প্রাণ দিতে চায়। নবীন সেনের কবিতা -

যখন নিরখি তব কোমল অধর;
বিমোহিত মন অলি কাঁপে থর থর
কিন্তু তারে প্রবোধিয়ে করি নিবারণ
কি কাজ সে সুখে যাহা দুখের কারণ
যুগল কমল কলি কোমল কিরণে,
ফুটাইতে কর-বৃন্তে সাধ হয় মনে
কিন্তু পুন ভাবি যদি হৃদয়ে তোমার,
এ পাপ পরশে হয় দুখের সঞ্চার।
এই ভয়ে মনোভাব মনেতে লুকায়,
যথাক্ষুদ্র বারিবিম্ব সাগরে মিশায়।

এই সঙ্গে মনে করুন 'পূরবী'র আশঙ্কা কবিতা। এখানে নায়িকা প্রবল শক্তিশালিনী, কবি তাকে তপস্বিনী বলছেন। তার প্রেমের হোমাগ্নিতে আহুতি দেবার মত কোন সম্পদ নায়কের নেই। সে নায়ক বলছে

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব তরে
চাপাই বোঝা তোমার পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে
সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনে খুলে

এ দুটি কবিতার জাত যে এক নয় তা পাঠককে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই এ কবিতার নায়ক নায়িকার কোমল অধর দেখে চঞ্চল নয়, যুগল কমল-কলি কর-বৃন্তে ফোটাবার সাধ তার নেই, প্রেম তার অন্তরের গভীর ভাবের সামগ্রী। এখানে সমাজ বাধা দেয়নি, নায়ক-নায়িকার নিজের ভিতরেই বাঁধা আছে। এ ভালবাসা পারস্পরিক শ্রদ্ধার নিবিড় সূত্রে বাঁধা। এখানে দুঃখে ভেঙে পড়ে নৈরাশ্যের বুকভরা জ্বালায় প্রেমিক পাগল হয়নি—নায়ক নিজেই সরে যাবার সময় বলছে —

তাই তো আমি বলি তোমায় নতশিরে
তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নবীনচন্দ্রের দিনে যা ছিল পূরবীর যুগে তা ছিলনা। এখানে সমাজের ভয় আর মিলনের বাধা নয়। প্রেমের গভীরতায় এই বিচ্ছেদ তারা নিজেরাই মেনে নিয়েছে। রচনার দিক থেকে নবীনচন্দ্রের সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগপূর্ণ মুহূর্তগুলিকে তিনি প্রায় বর্ণনাত্মক করে তুলেছেন তা গীতিকবিতার বিষয়বস্তু হয়েও গীতিকবিতা হলো না।

'সানাই'কে এই বিরহের কাব্য বললেও ক্ষতি নেই। বিরহের নানা অবস্থা কবি এই কাব্যে ফুটিয়েছেন। তবে তার মধ্যে একটি কথা সর্বত্র সমানভাবে প্রবল—সে হলো আত্মজয়ের। প্রেমের দাবী যদি প্রবল হয়ে উঠে নিজের ক্ষুধাকে বীভৎস করে তোলে, তা হলে সে প্রেম ব্যর্থ। তেমনি বিরহ যদি দায়িত্বের আচরণের প্রতি আমায় ক্ষুব্ধ করে তোলে, তা হলে প্রেমের শক্তির প্রমাণ হলো না। ভালবাসা যত গভীর, বিরহের বেদনা বহন করার শক্তিও তার তত বেশী। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল ধরেই প্রেমের এই আন্তরিক শক্তির কথা চিন্তা করেছেন, জয়গান করেছেন এবং দুঃখের মধ্যে, বিরহের মধ্যে, সান্ত্বনা ও পরিণতি লাভের কথা মানুষের মনে সঞ্চারিত করেছেন। তাই মদনকে ভস্মশয্যা ছেড়ে ওঠার আহ্বান করেছেন। বীরের তনুতে অতনুকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। মহুয়ার কবিতাগুলির জাত ভাগ করার সময় কবি বলছেন যে একজাতের কবিতা আছে যেগুলিতে "প্রণয়ের প্রসাধন কলা মুখ্য।" তেমনি আর একটি জাত আছে যেগুলিতে "ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।" 'সানাই'য়ের প্রেমের কবিতা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। এখানে প্রণয়ের প্রসাধন নেই, বিরহ বেদনাজাত সাধনার উপলব্ধি আছে।

রবীন্দ্রনাথের পূরবী ও মহুয়াতে প্রেমের যেটুকু মিলন আছে এখানে তাও নেই। শেষবারের মত কাননে বসন্তের ফুল সঞ্চয় করতে যাব—এ কথা শোনবার জন্যেও কেউ নেই—এ শেষবারেরও পরের কথা। এ কাব্য একান্তই বিরহের কাব্য। তবু দু-একটি কবিতা খুঁজলে পাওয়া যাবে যেখানে শেষবারের দেখা শোনা হচ্ছে। সেই শেষ মিলনের মধ্যে একটি গভীর আত্মনিবেদনের ভাব আছে। যে প্রেমের কোন অভিযোগ নেই, যে পেলে খুসী হতো, না পাওয়াতেও ক্ষুব্ধ নয় এ কবিতাগুলি তারই। উদাসি হাওয়ায় পথে পথে মুকুল ঝরে পড়েছে প্রেমিক তাই কুড়িয়ে এনে বলছে লহ করুণা করে। এ দুর্বলতা নয়, এ কৃপাভিক্ষা নয়, শেষ বিদায়ের আগে যুগল-

চিত্তের পারস্পরিক স্বীকৃতি। সেই ফুলগুলি নিয়ে দুজনে বসবে ফুলবিছানো ঘাসে 'কানাকানি সাক্ষী রইবে তারা, বউ কথা কও ডাকবে তন্দ্রাহারা'। তারপর যখন সেই একটি লগ্ন চলে যাবে তখন কোন দুঃখ, কোন বেদনার কথা কাউকে না জানিয়ে বিদায় নেবে—'স্মৃতির ডালায় রইবে আভাসগুলি কালকে দিনের তরে।' কিন্তু অধিকাংশ কবিতাই দেখাশোনা সম্পূর্ণ শেষ হবার পর। তখন প্রেমের প্রকাশ কবির মনের নানা মায়ায়, গোপন বাসনায়। এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে 'মায়া'। কোন পুরোনো দিনের প্রেমের স্মৃতি এর বিষয়বস্তু। আজ সেই প্রেয়সী নেই তাকে দূরে মনে করাও যত সহজ কাছে ডাকাও ততই সহজ

নাই কোন ভার নাই বেদনার তাপ
ধূলির ধরায় পড়েনা পায়ের ছাপ।

বিরহ মনের ভিতরে নানা মায়ার সৃষ্টি করে। সেই মায়া এত সত্য যে মিলনের সম্ভাবনাও কবির কাছে অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে। কবির নিজের মনের মায়ার সঙ্গে প্রত্যাগত প্রেয়সীর কায়ার মিল হবে কিনা সে সন্দেহ কবির মনে আছে তাই বলছেন

যদি জীবনের বর্তমানের তীরে
আস তুমি কভু ফিরে
স্পষ্ট আলোয়, তবে
জানিনা তোমার মায়ার সঙ্গে
কায়ার কি মিল হবে।

বিরহের সুর মনের মধ্যে এত নিবিড় করে বাঁধা হয়েছে যে আজ নতুন করে মিলনের কথা বললেও মনে আঘাত লাগেনা। দুঃখের মধ্যে কবি আপন সান্ত্বনার জন্য যে মায়ালোকের সৃষ্টি করেছিলেন আজ সেখানে সশরীরে প্রেমিকা যদি ফিরেও আসেন তাহলে সে মিলনে আর কারও সাড়া মিলবে কি।

আর একটি কবিতা 'অদেয়'। প্রেমের প্রসাধন ছিল, সত্য ছিলনা। দেবার সময় কৃপণতা করে, দৈন্যবশে সব দিইনি। সেই কৃপণতা যৌবনের অসম্মান তার আঘাত নিজের উপরেই ফিরে আসে। তাই যখন বাইরের জগতে আনন্দের প্রবল স্রোত চলেছে তখন ফাঁকির শোধ উঠছে ভিতরে —এত বড় সংসারে নিজের একাকীত্বের কথাটাই প্রবল হয়ে উঠছে। তারপর মনে এলো অনুতাপ, আমি না হয় ফাঁকিই দিয়েছি কিন্তু তুমি কেন আমার সেই ফাঁকিকে স্বীকার করলে। তুমি অভিমান করে কিছুই বললেনা— তাই তো আমার ভালবাসা আজ একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল। এ কবিতা সম্বন্ধে কবির নিজের বক্তব্য আছে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে।—

তোমার অভিমান
আঁধার করে আছে আমার সমস্ত জগৎ
পাইনে খুঁজে সার্থকতার পথ।

ঠিক এই কবিতার পাশেই আছে 'শেষ কথা'। এখানে বলছেন তুমি নানাভাবে ছলনা করলে দিলেনা কিছুই। যদিও জানি তোমার মনে প্রেম নেই, তবু তোমায় অবহেলা করতে পারিনি। আমার সেই দুর্বলতার সুযোগ তুমি নিয়েছ। তোমার এই সংকীর্ণ কার্পণ্য তোমাকেই বঞ্চনা করবে।

কভু কি জানিতে পাবে অসম্মানে নত এই প্রাণ
বহন করিছে নিত্য তোমারি আপন অসম্মান।
আমারে যা পারিলে না দিতে
সে কার্পণ্য তোমারেই চিরদিন রহিল বঞ্চিতে।

প্রেমের দ্বারা আমরা যে নিজেদেরই নতুন করে ফিরে পাই এ কথা কবি বার বার বলেছেন। এ কথা ঠিক যে এসব কবিতার সুর নৈর্ব্যক্তিক। তবু প্রেমের একটি চিরন্তন সত্যকে কবি অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। ভালবাসার নামে ছলনা হৃদয়কে অতৃপ্ত করে রাখে দুজনেরই।

'যক্ষ' কবিতা পূর্বোক্ত কবিতাগুলির মত হৃদয়সমস্যার কথা নয়। যক্ষের বিরহ যে নিছক বিচ্ছেদ মাত্র নয় এ কথা কবি বহুদিন ধরে বলে আসছেন। বিরহের একটা নিজস্ব শক্তি আছে যেটা প্রমত্ত মিলনের দিনে বোঝা সম্ভব নয় কিন্তু যেদিন বিচ্ছেদ আসে সেদিন বিরহের শক্তি আপনি জেগে ওঠে। সেদিন সুন্দরের আবির্ভাব নিজের বেদনার ভিতর আরও সহজ হয়। তাই কালিদাসের যক্ষ ধন্য, তার বেদনা তাকে স্রষ্টা করে তুলেছে—

ধন্য যক্ষ সেই
সৃষ্টির আগুনজ্বালা এই বিরহেই।

কিন্তু সেই যক্ষিণীর কি হলো—কাব্যের সেই আর একটি উপেক্ষিতা। যে সৃষ্টি করলো তার বেদনা থেকে তার তো মনের ভার কমলো। তার বিরহ সার্থক হলো। কিন্তু যার বেদনা শুধু বুকের মধ্যে গুমরে মরলো, সৃষ্টির সাধনা যার সফল হলো না তার জন্য কী সান্ত্বনা রইলো।

তারতরে বাণীহীন যক্ষপুরী ঐশ্বর্যের কারা অস্তিত্বের এত বড় শোক
অর্থহারা নাই মর্ত্যভূমে
নিত্যপুষ্প নিত্য চন্দ্রালোক জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে।

'পরিচয়' কবিতাটি গল্পের ভঙ্গীতে লেখা। একটি মেয়ের যৌবন এসেছে। মনে তার ভালবাসার ঢেউ উঠেছে—জেগেছে রোমান্স—"রোমান্স বলে একেই, নবীন প্রাণের শিল্পকলা আপনা ভোলাবার।" যার জন্যে তার এত ব্যাকুলতা সে তো ধরা দেবার জন্য তৈরী হয়েই ছিল। সে ছিল কবি, কাব্য লিখতো তার মানসসুন্দরীকে নিয়ে। তাকে ভোলাবার চেষ্টা করতে গিয়ে মেয়েটি নিজেকে ভুলে বসে রইলো। আর একটি মেয়ে যার নাম রণিতা সে এসে পড়লো মধ্যে। আপাততঃ জয় হলো তারি। তখন সেই বিরহের মধ্যে নায়িকা বুঝলে যে তার নিজের ভিতরকার রহস্য সব শেষ হয়নি। যাকে প্রতিদিনের করে পাবার চেষ্টা চলছিল তার ভিতরে প্রতিদিনের চেয়ে বেশী যে তাকেই যেন খুঁজে পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভিতরেও যে অসাধারণত্ব ছিল সে জেগে উঠলো

যে তুমি নও প্রতিদিনের সেই তোমারে দিলেম যে অঞ্জলি
তোমায় বেড়া দিতে গিয়ে আমায় দিলেম সীমা।
তবু মনে রেখো
আমার মধ্যে আজও আছে চেনার অতীত কিছু।

ভাগে এসেছিল রণিতা তাই তো জানা গেল যে "তুমি নও প্রতিদিনের" তাই তো জানা গেল আমার মধ্যে চেনার অতীত আজও কিছু আছে। মিলনের মধ্যে জানাশোনা শেষ হলোনা বলেই তো এত গভীর করে বোঝা গেল নিজেদের। এ কবিতার ভাষা তীব্র, ভাব স্পষ্ট, লালিত্যের মাধুরীর চেয়ে স্পষ্টতার তীক্ষ্ণতা এখানে প্রবল। লেশমাত্র চিহ্ন নেই ভাবপ্রবণ দুর্বলতার—যেমন

'স্বপ্ন ঘোড়ায় চড়া তুমি খুঁজতে বেরিয়েছ
তোমার মানসসীকে'
কিংবা 'ঝরোখা সব খুলে যেত হৃদয়-বাতায়নে
ফেনায়িত সুনীল শূন্যতায়
উজাড় পরীস্থানে।'

ইংরাজী কথার বাংলা রূপান্তর এরই মধ্যে চলে গেছে অতি সহজে 'চা-পান সভায় হাটুজলের

সখ্যসাধনার।'

'হঠাৎ মিলন' তত্ত্বহীন বিরহের কবিতা। একদা দুজনে অতি কাছাকাছি এসেছিল তখন বলার মত কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর আর দেখা হলো না, তখন নিজের বেদনাভরা অবকাশ কেমন করে ভরবে? একটি অনন্ত শূন্যতা বিরহীর কাছে বিরাট সমস্যা হয়ে এসে দাঁড়ালো তখন আপন মনে গান গেয়ে অর্থহীন মুহূর্তগুলিকে ভরে তোলার চেষ্টা।

'তখন আমি আপন মনে যে গান সারাদিন পাথর-ঠেকা নির্ঝর সে তারি কলস্বর
গেয়েছিলেম তাহারই সুর রইল অন্তহীন দূরের থেকে পূর্ণ করে বিজন অবসর।'

'মায়া' কবিতায় বলেছেন যে প্রেয়সী যদি আজ ফিরে আসে তাহলেও হয়তো আর মিলন হবেনা—কারণ এতদিনকার বিরহে তাকে নতুন করে সৃষ্টি করেছে। 'দূরবর্তিনী'তে যা বলেছেন সে তারি অন্যরূপ। যখন দূরে ছিলে তখন তোমায় কেবলি নতুন করে জেনেছি। তখন তোমার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের যা কিছু দূরের তারই সুর বাজতো, আজ যখন তুমি কাছে তখন আর তো সেই সুর বাজে না। আর তো পালে দক্ষিণ হাওয়া লাগেনা, আর তো মাঘের রাতে আমের বোলের গন্ধ তোমার বেদনার সাথে মেশে না, জীবনের সেই ব্যাকুল আবেগ স্তব্ধ; উৎসুক প্রত্যাশা ব্যথা সব চলে গেছে।

অলস ভালোবাসা ঘরের কোণের ভরাপাত্র দুইবেলা তা পাই
হারিয়েছে তার ভাষাপারের ভাষা ঝরণাতলার উছলপাত্র নাই।

এ কবিতা বিরহের নয়। মিলনের মধ্যে প্রেমের তৃপ্তি নেই, যে মিলন শুধু ঘরের কোণে পোষমানা দিনের পিছু পিছু ছুটে চলে। এর চেয়ে যে প্রিয়া ছিল দূরে সেই যেন ভাল ছিল। বিরহের না হলেও এ কাব্যে ভালবাসার পূর্ণতা নেই। মানসীতে বলেছিলেন যে যদি ভালবাসা না থাকে তবে মিথ্যা ছলনা করোনা—সেদিন বলেছিলেন

'বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশি
এখন কেবল চরণে শিকল কঠিন ফাঁসি।'

আজ বহুদিন পরে প্রেমের মধ্যে সেই বাঁশী থামলো বটে কিন্তু আজ আর তাকে কঠিন ফাঁসি মনে করার মত অসহিষ্ণু কবি নন। আজ প্রশান্ত মনে বলছেন যে জীবনের কোন প্রয়োজনই অপূর্ণ নেই 'ঘরের কোণের ভরাপাত্র দুইবেলা তা পাই।' আরও বেশী পাইনে বলে অতৃপ্ত আছে কিন্তু যা পেয়েছি তাকে ফাঁসী মনে করার অসহিষ্ণুতাও গেছে।

আর একটি বিচিত্র কবিতা 'বিস্মৃতা'। সমগ্র কাব্যেই দেখা যাচ্ছে যে প্রেম স্বীকৃতি লাভ করছেনা—কেন করছেনা। নায়িকার মনের একটি ছবি কবি এই কবিতায় তুলে ধরলেন। চিত্রসম্পদে এবং চিত্রের ব্যঞ্জনায় এই কবিতা বিশিষ্টতা লাভ করেছে। পার্বত্য নদী চলে আপন পথ ধরে, হঠাৎ কখন পথের পরিবর্তন হয় তার কেউ জানেনা। সে নদীতে যদি কেউ পণ্যভাসায় তাহলে সর্বনাশ। সে নদীকে যতই ভালবাসুক কেউ 'সে আমার' বলে আস্ফালন করা বৃথা। এই চিত্রধারার অন্তরালে কবি বলছেন নায়িকার কথা। বিরহের কাব্যে এই নায়িকার সন্ধান মেলা আশ্চর্য নয়। তার এই বাঁধনহীন মন কত হৃদয়ভাঙ্গার কারণ হয় —

মন যে তাহার হঠাৎ প্লাবনী নদীর প্রায়
অভাবিত পথে সহসা কি টানে বাঁকিয়া যায়।
সে তার সহজ গতি
সেই বিস্মৃতা ভরা ফসলের যতই করুক ক্ষতি।

সেই হঠাৎ প্লাবনী নদী ভরা ফসলের ক্ষেতের খাতির করেনা। যদি মনে করে থাকি যে পথে নদীর চলা উচিত সেই পথেই সে চলবে তাহলে বার বার তার কূল ভেঙ্গে সে আমার ভুল ভাঙ্গাবে। প্রেমের স্বাভাবিক রীতি এ নায়িকা মানেনা। তাই ভরা হৃদয়ের দান অবজ্ঞাভরে অবহেলা করতে তার কোন দ্বিধা নেই। এই দুর্দাম নদীর এই অকারণ কলহাস্যবেগকে যদি খেলা বলে গোড়া থেকে মেনে নাও তবে খেদ থাকবেনা—এ যেন মাতাল চলার চলতি কারবার—

"এ খেলারে যদি খেলা বলি মানো
হাসিতে হাস্য মিলাইতে জানো
তা হলে রবে না খেদ।"

নায়িকা চরিত্রের এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য যে বোঝেনি তাকেই তো পাষাণে আছাড় খেতে হয়। একে শুধু ক্ষণিকের চলতি খেলা বলে মানা যায় না বলেই এত হৃদয়বিদারণের বাড়াবাড়ি। তাই অবশেষে বল্লেন শুধু যদি মানব মনের রহস্য বলে মনে করতে পারো তবেই কাছে এস।—

'সে আমারি' বলে বৃথা অহমিকা
ভালে আঁকি দেয় ব্যঙ্গের টিকা
আলগা লীলায় নাই দেওয়া-পাওয়া
দূর থেকে শুধু আসা আর যাওয়া
মানব মনের রহস্য কিছু শিখা।'

এ কথা মনে রাখতে হবে যে এ কিন্তু 'সানাই'-য়ের নায়িকা নয়। অন্যান্য কবিতায় যে নায়িকাকে দেখেছি তার জীবনে বিরহ এত আলগা স্বভাবের খেয়াল থেকে জাত নয়। সে নায়িকার কাছে প্রেম অনেক গভীর অনুভূতি—বিরহের মায়া সেখানে বর্তমানের কায়ার চেয়ে সত্য। এ কবিতা হঠাৎ দলছাড়া হয়ে এসেছে—চতুর ভাষায় এ এক খেয়ালী নায়িকার কাহিনী—একে উদ্দেশ্য করে বলা শক্ত 'প্রাণের সাধন কবে নিবেদন করেছি চরণতলে।' যে নায়িকা ছলনা করে আর যে প্রত্যাখ্যান করে তারা তো এক নয়। যেখানে প্রত্যাখ্যান নিজের বেদনাকে নিয়ে নূতন স্বপ্ন নূতন মায়া, নূতন সৃষ্টি সম্ভব। আর যেখানে ছলনা সেখানে আশাভঙ্গের ব্যর্থতা আর দাহন। তবু কবির নায়ক সকল ক্ষেত্রেই সেই শান্ত ধৈর্য আর ভদ্রতার চিহ্ন বহন করে যেটা তার আন্তরিক শক্তির প্রকাশক।

'অসম্ভব' কবিতা লিরিকের একটি সার্থক উদাহরণ। মনে মনে যখন পূর্ণ বিচ্ছেদকে মেনে নেবার চেষ্টা চলছে তখনই মনের ভিতর থেকে জাগ্রত একটি গভীর বেদনা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে তা অসম্ভব। সব যুক্তিকে ছাপিয়ে মনের একান্ত কামনা কেবলই এই বিচ্ছেদকে অস্বীকার কর্চ্ছে। এ কবিতা শুধু প্রাণ থেকে বলছে যে এ বিচ্ছেদ অসম্ভব। বহুবর্ষার রাতের মিলনকে স্মরণ করে এবারের শ্রাবণে "মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব"। যখন নবমালতীর সৌরভে বেণীবন্ধনের কথা মনে পড়ে, যখন বাতায়নে গিয়ে শোনেন অশ্রুজলের আভাসে কবির গান বেজে চলেছে সেতারে তখন 'মন শুধু বলে—অসম্ভব এ অসম্ভব।'

আর একটি কবিতার আলোচনা করলে সানাইয়ের প্রেমের পর্যায়ের কবিতাপাঠ শেষ হবে আমাদের। সে সুর 'অসম্ভব' কবিতার মতই স্পষ্ট। 'স্বল্প' কবিতায় প্রেমিক গোড়া থেকেই তার চাওয়াকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। সে জানে যে অনেকটা পাওয়াই থাকে মনে মনে, সবটাই হাতে মুঠো করে পাওয়া যায় না। রোমান্টিক প্রেমিক কিছু না-চেয়েই নিজেকে মূল্যবান করে তুলেছে। নিজের ভালবাসা তাকে ভিতর থেকে এত পূর্ণ করে রেখেছে যে বাইরের প্রতিদানের অপেক্ষা সে করেনি। তাই প্রেমিক বলছে

'যে দানে ভার থাকে
বস্তু দিয়ে পথ সে কেবল
আটক করে রাখে।'

'সানাই'য়ের প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে একটি নম্র বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি আত্মসচেতন বলিষ্ঠ তার সুর আছে। প্রেমের জুলুম নেই তার বাইরের প্রকাশে কোন শক্তির ব্যবহার নেই। শক্তির ব্যবহার ভিতরে, প্রেমিক যেখানে ব্যর্থতার পরিণামকে অত্যন্ত সহজে মেনে নিয়েছে। ভালবাসা সত্য বলেই তার হা-হুতাশ নেই, আত্মসংযত প্রশান্তি আছে।

আর কয়েকটি কবিতা আছে সেগুলি প্রেমের নয়। কবির তখনকার মন সেই কবিতাগুলিতে প্রতিফলিত। সেগুলিতে কোথাও কোথাও আসন্ন বিদায়ের সুর বেজেছে। আসা-যাওয়ার ভার প্রকাশ পেয়েছে মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে লেখা কয়েকটি কবিতায়। এই শ্রেণীর কবিতা দূরের গান, কর্ণধার, সানাই, স্মৃতির ভূমিকা, মানসী, অধীরা নারী, শেষ অভিসার, অপঘাত, অবসান।

'দূরের গান' সানাইয়ের প্রথম কবিতা। পূর্বকালে যে কথা বলেছিলেন গানে—'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'—সে গানের সঙ্গে এই কবিতার তফাৎ এই যে গভীরতর উপলব্ধি এই কবিতাকে আরও সম্পদশালী করেছে। রোমান্টিক হৃদয়বেদনার সুরের চেয়ে ভাবের সুর অনেক গভীর হয়ে বেজেছে। সেখানে সুদূরকে উদ্দেশ করে কবি বলছেন "ওগো মনে প্রাণে আমি যে তোমার পরশ পাবার প্রয়াসী।" সে কথা একান্তই রোমান্টিক ভাবানুভূতির আবেগসঞ্জাত। কিন্তু দূরের গান তা নয়। তার মূল্য অবশ্য ঐ একই রোমান্টিক ভাবের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু কবির বিশ্বাস শুধু উচ্ছ্বাসেই পর্যবসিত নয়, সমুদ্রতলের গভীরতার মতই তা স্থির। তবে সেই বিশ্বাসকে রূপ দিতে কবি আশ্চর্য শিল্পকর্মের পরিচয় দিয়েছেন। বার্ধক্যের জীর্ণতা পরাজিত; শুধু যে মনের ভাবনাই চলেছে তা নয়, নতুন রূপসৃষ্টির সার্থক পরীক্ষা তখনও চলেছে সমানে। এখানে ভাষা অনেক সংহত, চিত্ররূপের প্রাচুর্য লক্ষ করবার মত। তার স্পষ্টতা ও ঋজুতা কবির সচেতন প্রচেষ্টার সাক্ষী। কিন্তু তীক্ষ্ণ হলেও ভাষার সেই লালিত্য ও কমনীয়তার অভাব ঘটে নি যাতে হৃদয় বেদনা প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন

ফেনোচ্ছল সে নদীর বন্ধহারা জলে
পণ্যতরী নাহি চলে
কেবল অলস মেঘ ব্যর্থ ছায়া ভাসানের খেলা
খেলাইছে এ বেলা ও বেলা।

কবিত্বের উচ্ছ্বাস যাকে আমরা সাধারণতঃ বলি তা এই অংশে নেই। ভাষা স্পষ্ট কিন্তু তবু কর্মহীন নদীতটের অলস ছায়ার বেদনাটুকু অনুভব করা যাচ্ছে।

কবির মন দূরের স্পর্শ পায় তার স্বপ্নের মধ্যে। যা অতি নিকটের তার মধ্যে দূরের প্রতিফলন দেখে কবির মন। যে কাছে আছে তাকে নানা সম্পর্কের দ্বারা বেঁধে রাখি—তাকে তার স্বরূপে দেখতে পাইনে—তাই প্রেয়সীর দৃষ্টি কবির চিত্তকে অকূলে মুক্তি দেয় যে নিকটের তাকে দূরদূরান্তে ব্যপ্ত হতে দেখে কবির তৃপ্তি —

নীল আলো প্রেয়সীর আঁখি প্রান্ত হতে —
নিয়ে যায় চিত্ত মোর অকূলের অবারিত স্রোতে
চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে
অজানার অতিদূর পারে।'

চিত্ররূপের ঐশ্বর্যে এ কবিতা সমৃদ্ধ। নিজেকে তুলনা করেছেন একটি দীপজ্বালা ভেলার সঙ্গে। সে ভেলার কোন বাসা নেই সে যে কোন্ অধরার অন্বেষণে চলেছে তা কেই বা জানে। অবশেষে তাঁর বক্তব্য হলো এই যে তাঁর বাঁশীতে সেই দূরের সুর বেজেছে। যে বাণী অরণ্যের রহস্যের মধ্যে ব্যক্ত সেই বাণী এই বাঁশীর সুর ধ্বনিত হবে। যে বাণী তারায় তারায় রোমাঞ্চিত

সেই বাণী ধরা পড়বে এই সুরে—

এ বাঁশি দিবে সে মন্ত্র যে মন্ত্রের গুণে
আজি এ ফাল্গুনে
কুসুমিত অরণ্যের গভীর রহস্যখানি
তোমার সর্বাঙ্গে মনে দিবে আনি
সৃষ্টির প্রথম গূঢ়বাণী।

রোমান্টিক মনের এই প্রকাশ আমরা আগেও দেখেছি। শুধু আগেকার মত সহজ উচ্ছ্বাস আর নেই তার সংযত হয়ে প্রশান্ত ভাষার বাঁধনে ধরা দিয়েছে।

'কর্ণধার' জাতীয় কবিতাও আমরা আগে দেখেছি। তাঁর সমস্ত জীবনের বহুবিচিত্র সাধনার জটিল স্রোতের মধ্য দিয়ে একজন তাঁকে ক্রমাগত চালিয়ে নিয়ে চলেছেন এ কথা বহু কবিতায় বহু প্রবন্ধে তিনি বলেছেন। তিনি জীবনে মরণে কেবলই কবির সঙ্গে আছেন এবং সকল রহস্যের মূল মন্ত্রটি তিনিই বাজিয়ে তুলছেন। একদিন 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় বেরিয়েছিলেন সেদিন এক অপরিচিতা কৌতুকময়ী নানারূপে তাঁকে দূর থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল। আজও জীবনে সেই কর্ণধারের প্রতি ভরসা ঘুচলো না তাঁর। এবার যে দূরের ডাক এসেছে, সংসারের সংকীর্ণ বন্ধন ছেড়ে এবার যে বেরুতে হবে, জীবনমৃত্যুর সীমায় পাল হতে হবে। সে সবই তো কর্ণধারের নেতৃত্বে। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র চলা ছিল জীবনেই, এবার চলা জীবনের প্রান্ত পেরিয়ে

"বক্ষে যবে বাজে মরণ ভেরী
ঘুচিয়ে ত্বরা ঘুচিয়ে সকল দেরী
প্রাণের সীমা মৃত্যুসীমায়
সূক্ষ্ম হয়ে মিলায়ে যায়
ঊর্ধ্বে তখন পাও তুলে দাও
অন্তিম যাত্রায়।"

'সানাই' কবিতার মর্মকথা আমাদের অজানা নয়। সংসারের নানা বিচ্ছিন্ন খণ্ডের মধ্যে একটি সুষমা আছে একটি ঐক্য আছে। সেই ঐক্যে সানাইয়ের সুর বেজেছে। সৃষ্টির মূল উৎস থেকে প্রথম উৎসারিত সুরের ধারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবরোধ থেকে আজও মুক্ত করছে আমাদের। সে সুর আমাদের প্রতিদিনের মালিন্যের দ্বারা পীড়িত নয়। সানাই যেন সেই সুর বাজাচ্ছে, বিয়ের দিনের সব কোলাহল ভেদ করে 'কি নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান।' 'মানসী' একটি ভাবকল্পনার কবিতা। কবি কল্পনা করছেন যে পরবর্তী কালে যখন তিনি থাকবেন না তখনও তো তার কবিতা থাকবে। যখন কবিতার জন্মমুহূর্তটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে তখনও সেই কবিতা সকলকে আনন্দ দেবে। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই কবিতা রচনার একটা উল্লেখ আছে। রেডিওতে বিদেশী গান শুনতে শুনতে মনে হল এই গানের সঙ্গে সেখানকার বর্তমান রাজনীতি, দলাদলি, যুদ্ধবিগ্রহ কিছুরই তো যোগ নেই। তেমনি যে কবিতা লিখেছিলেন পদ্মার বোটে চতুর্দিকে ভরা ফসলের সঞ্চয়ের মধ্যে কোথায় গেল সেই কবিতার পরিবেশ, কিন্তু কবিতা রইলো

জন্মসাথী হারা
কাব্যখানি পাড়ি দিল চিহ্নহীন কালের সাগরে
কিছুদিন তরে;

সোনার তরীতে যা বলেছিলেন এ তারই নব রূপায়ণ—সেখানে বলেছেন যে ফসল রইলো তরীতে কিন্তু ফসল ফলালো যে তার ঠাঁই হলোনা। এখানে বলছেন কবিতা ভেসে যায় কালের সাগরে —'কবিরে পশ্চাতে ফেলি শূন্যপথে চলিয়াছে বাজি।'

অধীরা প্রকৃতির কবিতা। সানাইয়ের বিরহ এবং ভাবগভীর কবিতাগুলির মধ্যে অধীরা একক। কারণ প্রকৃতির কবিতা আর নেই। এ কবিতার সঙ্গে এর জন্মমুহূর্তের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

সে কথা কবির নিজের ভাষাতেই শোনা যায়— একদিন বাইরে প্রবল ঝড় উঠেছে, গাছপালা মেতে উঠেছে তাণ্ডব নাচে—প্রকৃতির মূর্তি রুদ্র। সেই রুদ্র প্রকৃতির অধীরতাকে কবি নাম দিয়েছেন অধীরা। তিনি বলেছেন 'এ কিন্তু তোমার বেথুন ইস্কুলের বেণী দোলানো অধীরা নয় ..... কাল ঝড়ের প্রলয় মূর্তির দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এক চঞ্চলা অধীরা ছুটে চলেছে, সে বন্ধন মানেনা, সে দুর্বার ..... সে বিদ্রোহিনী .... সমস্ত সংকোচ-আবরণহীন একটা সত্যমূর্তি প্রকৃতির আছে— সে চঞ্চলা অধীরা, সৃষ্টির বেদনা বহন করে অনাদিকাল থেকে ছুটে আসছে, —সে আসছে

'নিলাজ ক্ষুধায় অম্বরবসে নিঃসঙ্কোচ আঁখি
ঝড়ের বাতাসে অবগুণ্ঠন উড্ডীন থাকি থাকি।'

এই বেগ তো শুধু বহিঃপ্রকৃতির নয়, এ তাঁরও অন্তরের বেগ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনের সজল সজীবতা তাঁর ক্ষুণ্ণ হয়নি কোথাও। রুদ্র প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় কবির ভাষা তার সাবেকী তীক্ষ্ণতা হারায় নি একটুও। প্রকৃতির গতি, শক্তি আবেগ কবির ভাষায় ধরা পড়েছে

হুহু হুংকার ঝর্ঝর বর্ষণ দুর্দাম প্রেম কি এ
সঘন শূন্যে বিদ্যুৎ ঘাতে প্রস্তর ভেঙে খোঁজে উত্তর
তীব্র কি হর্ষণ। গর্জিত ভাষা দিয়ে।

'শেষ অভিসার' কবিতা সেই অভিসারিকাকে স্মরণ করে লেখা যিনি কবির দৃষ্টিতে অসীম বিস্ময়ের আলো এনে দিলেন তিনিই আজ দুযোগের শেষ অভিসারের মালা বুনন করে এনেছেন। যিনি একদিন ধরণীর বহুবিচিত্র রূপের সঙ্গে মিলন ঘটিয়েছেন তিনিই আজ অজানার সাথে মিলন ঘটিয়েছেন তিনিই আজ অজানার সাথে মিলন ঘটিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন ধরণীর পারে।

এই তব শেষ অভিসারে মিলন ঘটায়ে যাও অজানার সাথে
ধরণীর পারে অন্তহীন রাতে।

যেদিন নিরুদ্দেশযাত্রায় সুন্দরীকে উল্লেখ করেছিলেন সেদিন রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসই কবিচিত্তে প্রবল ছিল— আজ সেই উচ্ছ্বাস নেই; আজ জীবনকে একজন মৃত্যুর দিকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করে নিয়ে যাচ্ছেন এই বোধ ক্রমশঃ গভীর হয়ে উঠেছে। এই ভাব ছিল কর্ণধার কবিতার —এখানে তাঁকেই অভিসারিকা বলা হয়েছে।

'অপঘাত' কবিতার ভাব সংহতি লক্ষ করবার মত। একদিন রাশিয়ার আদর্শ তাঁর মন স্পর্শ করেছিল—সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা নতুন সমাজ গঠনের চেষ্টা তাঁর ভাল লেগেছিল। সেই রাশিয়া যেদিন ক্ষুদ্র ফিনল্যাণ্ডের উপর বোমাবর্ষণ করলো সেদিন তাঁর মনে আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করা কঠিন নয়। মনের এই ক্ষুব্ধ অবস্থাকে ভারী সুন্দর করে তিনি অপঘাত কবিতায় প্রকাশ করেছেন। যখন চৈত্রের মৃদুগন্ধ বাতাস, ও জারুল শাখায় কোকিল প্রলাপ মন ভুলিয়ে দেয় তখনই খবর এলো।— চৌলগ্রাম এল সেই ক্ষণে

ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হলো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।

একটি শান্ত পরিবেশের মোহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, চূর্ণ হলো আশা। এ কবিতার ব্যঞ্জনা গভীর সংসারের শান্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হলো—বিক্ষুব্ধ কবির আর কিছু বলার নেই।

'সানাইয়ের কবিতা 'নবজাতকে'র কবিতার মত মননশীলতা জাত নয়, কিন্তু নিছক ভাবাবেগজাতও নয়। প্রত্যেকটি কবিতায় যেমন হৃদয়াবেগের স্পর্শ আছে তেমনি ভাবনার একটি ক্ষীণ সূত্রের যোগও সর্বদা জড়িয়ে আছে। পরিণত মনের প্রকাশে কবিতাগুলি ভাবসমৃদ্ধ।

সানাইয়ের গানের অংশ অল্প নয়। বহু বিখ্যাত গান সানাইতে স্থান পেয়েছে।

দেদুলির অধিকাংশই প্রেমের গান। বাংলা লিরিক কবিতায় এ গানগুলির তুলনা নেই। অবশ্য এর প্রায় সবগানই বিরহের কবিতার সঙ্গে একসুরে বাঁধা। আবেগতপ্ত ভালবাসার মিলনের রঙীন মুহূর্তগুলি কোন শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে—পিছনে পড়ে আছে কত প্রতিশ্রুতি কত মন দেওয়া-নেওয়ার কথা। প্রাণের সাধন সব নিবেদন করার পরেও তাপের দিনে রসের বাদল নামেনি মনের গভীর অনুভূতির বেদনার দহনে পবিত্র হয়েছে—একটি স্তবক মুক্তর মত ঝলমল করে উঠছে—

যদি এ মাটিতে চলিতে চলিতে
পড়িত তোমার দান
এ মাটি লভিত প্রাণ,
একদা গোপনে ফিরে পেতে তারে
অমৃত ফলে।

কোন অভিযোগ নেই শুধু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া যে যদি অবজ্ঞা না করতে তাহলে তোমার ভালবাসা তোমারই কাছে নানা ঐশ্বর্য হয়ে ফিরে যেতো। 'উদাস হাওয়ার পথে পথে' গানটি বিদায় মুহূর্তের গান। যাবার আগে শুধু একটি কামনা রেখে যাওয়া—যাবার পরে আমায় স্মরণ করো—তখন 'স্মৃতির ডালায় রইবে আভাসগুলি।' রোমান্টিক মনের নানা সুরের বিচিত্রতায় এই গানগুলি অপূর্ব হয়ে উঠেছে। পদ্মদশীর বক্ষে তিনি অশ্রুত বনমর্মর শুনেছেন। অগোচর চেতনার অকারণ বেদনার ছায়া তার মনের দিগন্তে। যৌবনের পূর্ণ লাবণ্য নিয়ে এসে নায়িকা চলে গেল; তার কাছে শুধু একটি প্রশ্ন 'কেন বাধা হোল দিতে মাধবীর কণা।' বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল প্রেমের দান। কিন্তু সে কতক্ষণের। পাবার সঙ্গে সঙ্গেই হারাবার ভয় রয়েছে মনে। হারানোর ছন্দই এই সব গানের ছন্দ। তাই হাত পেতে নিতে নিতে মনে হয়েছে 'আজ এনে দিলে যাহা হয়তো দিবে না কাল।' এই প্রসঙ্গে অতি পরিচিত কয়েকটি গানের উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে—

"বৈশাখের কৃশ নদী পূর্ণ স্রোতের প্রসাদ না দিল যদি,
শুধু কুণ্ঠিত বিশীর্ণ ধারা তীরের প্রান্তে
জাগাল পিয়াসীমন।" (উদ্বৃত্ত)

"যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
এতদিন তারে বুঝিতে পারিনি
দিন চলে গেছে খুঁজিতে।" (গান)

"দোষী করিব না তোমারে,
ব্যথিত মনের বিকারে
নিজেরেই আমি নিজে নিজে করি ছলনা
(আত্মছলনা)

উদ্ধৃত উদ্ধৃতিগুলি কাব্য-মূল্য বোঝাবার প্রয়াস নিরর্থক। ব্যর্থ প্রেমের কারণ এখানে বাইরের পৃথিবীর কোন সামাজিক আইন নয়, কোন রীতিনীতি নয়। এ প্রেমের বাধা নিজের মধ্যে—তাই সঙ্গে সংগ্রাম।

'সানাই' তাঁর পরিণত মনের দার্শনিক সুরগুলিকে গানের সুরে ছড়িয়ে দিয়েছে। এর 'সানাই' নামকরণ সার্থক। সানাইয়ের সুর যে শুনতে জানে প্রাণ দিয়ে সে যেমন অনেক কিছু শোনে তেমনি এই কাব্যও সহৃদয় রসিককে অনেক কথা বলে যা তাকে বুঝে নিতে হয়। আর যে শুধু কান দিয়ে সুর শুনবে তার জন্যেও সানাইয়ের অভ্যর্থনা অল্প নয়।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

দেশী বিদেশী প্রেমের খসড়া

আমাদের দেশের ছেলেরা এদেশে প্রেম করে হয় করে বিবাহ, কেউ বা করে বন্ধুত্ব। কিন্তু দু' একজন আবার এমনও আছে, যারা এর কোনটাই করে না— কারণ আমাদের সমাজের আবহাওয়া তাদের গায়ের থেকে নামতে চায় না। অথচ এ দেশী বাতাসও ফাঁকে ফাঁকে ফুৎকার দিয়ে তাদের মনটা দেয় গুলিয়ে। আমাদের জানা একটি ছেলে ছিল এই রকমের। তার কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভ কেটেছে সংযমে ও স্বামী বিবেকানন্দের নীতির আদর্শে। পড়াশুনায় ভাল ছেলে সে, এখানে এল থিসিস্ লিখতে কিন্তু তোমাদের রাস্তায়, বাগানে, ক্যাফে ও কলেজে—সর্বত্র ছেলে-মেয়েদের অবাধ প্রেমাভিনয় দেখে হল তার চিত্ত চঞ্চল। এল বাসনা। একদিকে তার মনের একটা অংশ যেমন সাগ্রহে চায় সঙ্গিনীর সাহচর্য, অন্য অংশ কর্তব্য কঠোর সংযমের যষ্টি উত্তোলন করে তাকে শাসায় সংযত হতে। তার আর থিসিস্ লিখতে মন বসে না। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিশতে বা কথা বলতে তার হতে লাগল সঙ্কোচ, পাছে কেউ তার এই মনের অতি গোপন বাসনা ও আলোড়ন জেনে ফেলে। সে কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে না কারণ তার মনে সন্দেহ হয় যে আলাপ ঘনিষ্ঠ হলে সে হয়ত আকাঙ্ক্ষা করবে তার দেহের স্পর্শের। তার কাছে এরা সব শুদ্ধ। নারী, সে কোন্ সাহসে আনবে তাদের দেহে কলুষ। শেষে বাসনার তাড়না ও যুক্তি দুটোর মধ্যে সন্ধি করার কোন উপায় না দেখে সোজা সে চলে গেল একদিন—বহু জনসেবিকার পণ্যশালায়, ভাড়া করা পীরিতের সন্ধানে। নিয়মাভ্যস্ত সে, তাই তার এ বাসনার পরিণতিও পড়ে গেল বাঁধা ধরা নিয়মচক্রের খাদে। প্রতি বুধবার সন্ধ্যাবেলায় সে কেমন আড়ষ্ট ও শঙ্কিত হয়ে যেত কারণ সেই দিন তার ধার্য ছিল দেহবিপণীর আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য। বেশ বোঝা যেত সে সারা সন্ধ্যা নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাঙে তার ধৈর্যের বাঁধ। মদ্যপ যেমন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় মদ্য স্পর্শ করবে না শপথ করে, পরে ধাবিত হয় পানশালার দিকে আরও উত্তেজিত হয়ে—এও প্রায় সেই ভাবে চলত প্রতিবার, না যাবার শপথ করে—দেহের সাড়াকে ক্রীত মাংসপিণ্ডের ক্ষণ স্পর্শে স্তিমিত করে দেবার উদ্দেশ্যে। সকলেই জানত তার এই দুর্বলতা। যখন সাহস করে একজন জিজ্ঞাসা করল সে কেন বান্ধবীর সংগে সুযোগ না নিয়ে, ঐ বহুজনের ভোগালয়ে যায়? তার উত্তর এল যে, মনের সঙ্গে লড়াই করে হেরে সে যদি পাঁকেই নামল, থাক তার সে পংকিলতা একারই। শুধু ভদ্রা যুবতী বা নারীকে কলুষিত করতে সে প্রস্তুত নয়। যারা দেহের পণ্য বেচে তাদের সংস্পর্শে তার কোন গ্লানির কারণ নেই। কারণ তারা কেউই নিষ্কলুষ নয়।

দেশে ফিরে সে নিশ্চয়ই এতদিনে বিবাহ করে ঘর সংসার পেতেছে এবং বোধহয় মনে করে, যারা বিদেশে বান্ধবী নিয়ে করত মাতামাতি তাদের চেয়ে সে চরিত্রবান ও নিষ্পাপী।

বিবাহের বাইরে নারীর সাহচর্যের যে অন্তরায় আমাদের মনে, তাকে তোমরা ইনহিভিসান্ বলে বিদ্রুপ করতে পার কিন্তু আমরা এখানে অস্বাভাবিক সংস্কারবিহীন ভাব দেখিয়ে যতই আস্ফালন করি না কেন, স্বদেশের সামাজিক প্রভাবকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে

পারি না। এইজন্য অনেক ভারতীয় ছাত্র মনকে সংযত রেখে কোন নারীর হস্ত স্পর্শ পর্যন্ত না করে, তাদের ধারণায় নিষ্কলুষ হয়ে দেশে ফিরেছে। এই মনোবৃত্তি কেবল আমাদের দেশের লোকদেরই মধ্যে বলবৎ দেখা যায়। মার্থ হেসে বলল 'তাহলে তোমাদের দেশের লোকেরা প্রেম কি তা জানে না'। বললাম না মাদ্‌ময়জেল্, এটা তুমি ঠিক বললে না। আমাদের দেশের লোকে প্রেম করে,, কেবল তার ধারণা ও রীতি অন্যতর। তোমাদের দেশে কি এখন রোমিও জুলিয়েটের মতন বাস্তবে প্রেমাভিনয় দেখ? তার স্থান এখন কেবল রঙ্গমঞ্চে, অলীক কাহিনীতে মনোরঞ্জন মাত্র। বাস্তবে এই প্রেমাভিনয় দেখলে বলবে এ' কাফ্‌লাভ্'-এর চেয়েও ছেলেমানুষী। কিন্তু আজকের দিনেও আমাদের দেশে এই ধরণের প্রেমের দৃষ্টান্ত অবিরল নয়। আমার মনে আছে কলেজে পড়তে এক সহপাঠী একদিন এসে বলল তার মাতুলপুত্র আত্মহত্যা করেছে। সে যে তরুণীকে ভালবাসত তার সঙ্গে বিবাহ হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না তা জেনেও তারা পরস্পরে গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত হয়েছিল, যদিও কোনদিন হাতে হাত পর্যন্ত দেয়নি। যখন তরুণীটির অন্যের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করা হল, সে তার প্রণয়ীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ করে, এক চাঁদিনী রাতে বাড়ীর ছাদে ফুলশয্যা রচনা করে, গলায় মালা দিয়ে একত্রে বিষপানে আত্মহত্যা করল। তোমাদের আবেলার ও এলোয়াস্-এর স্বর্গীয় প্রেম, কি মাদাম বোভারির প্রেমের ভ্রান্তিও দেখতে পাবে আমাদের সমাজে—কেবল তার প্যাটার্ণে কিছুটা তফাৎ।

মার্থ একবার প্রশ্ন সুরু করলে, তা চলত ধারাবাহিক। ছোট ছেলেদের গল্প বললে যেমন ক্রমাগত বলে যায় 'তারপর কি হল'—তার প্রশ্নগুলিও প্রায় সেই রকম। সে বললে তোমাদের বিবাহ বিনা, স্ত্রী পুরুষের আদি প্রেম সম্ভব হয় না কিন্তু বিবাহের পর কি আদি প্রেমের মত প্রণয় ঘটতে পারেনা? তোমাদের আবেলার, এলোয়াস্ ও মাদাম্ বোভারিদের শেষ পরিণতি কি হয়? বললাম আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকায় বলতে পারি না— বিবাহের পর আমাদের দেশে আদি প্রণয়ের মতো সফল চুক্তিহীন প্রেম হয় কিনা। আর আমাদের আবেলার্ ও এলোয়াসরা বেশীর ভাগই করে আত্মহত্যা আর তা না হলে হয় দেশত্যাগী। আর মাদাম বোভারিরা শুদ্ধ সমাজে টিক্‌তে পারে না। তাদের বেশীর ভাগই ভীড় করে দেহের পণ্যশালাগুলিতে।

আমাদের সমাজে বিধিদাতা মনুর নাম শুনেছ? তার বিধানে, বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তানার্থে স্ত্রী গ্রহণ। তোমাদের দেশে বিবাহ বন্ধনের বাইরে প্রেমের যত ছড়াছড়িই হোক অন্ততঃ সন্তান কামনায় বিবাহ বন্ধনে তোমরা আমাদের মনুর বিধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছ। আমাদের দেশের বিবাহটা হয় শাস্ত্র মতে কিন্তু বিধির উদ্দেশ্যটা মুখ্য করে নয়। সন্তানরা আসে বাঞ্ছনীয় বলে নয়, বেশীর ভাগই অবাঞ্ছিত তারা, পৃথিবীতে আসতেই থাকে কারণ তাদের আসবার পথ, লোকে রুদ্ধ করতে পারে না বলে। স্ত্রী পুরুষের মধুর সম্পর্কের কোন্ পথটা উচিত বা অনুচিত তার সার্বজনীন সম্মত ধারণা এখনও করা যায় না। আমার মনে হয়, যতক্ষণ যে, যে সমাজে বাস করছে, তারই নীতি ও ধর্ম মেনে চলা উচিত। না হলে সমাজের ভিত্তি আল্‌গা হয়ে 'এনার্কি'র সূত্রপাত হবে। জোর করে সমাজের বিরূপ রীতি অন্য সমাজে আমদানী করলে কেবল বিক্ষোভেরই সম্ভাবনা। তোমার চোখ দেখে বুঝেছি, তুমি এখনই বলবে 'হোক না এনার্কি'। তার জবাবে বলব, এনার্কিতে হবে বহুজনের ক্লেশ ও আক্ষেপ। মানবের স্বভাব ধর্ম তা চায় না তাই, যা অনেক যুগ ধরে মানুষের সমাজ যাচাই করে চিনে নিয়েছে, মঙ্গলকর প্রবৃত্তি ও পথ বলে, সেগুলিকেই তারা চিরন্তন করে ধরে রাখতে

চায়। তার কিছুটা এসেছে ধর্মের বিশ্বাসে ও সমাজের নিয়ম ও নিষেধে কিম্বা রাষ্ট্রীয় আইনের কাঠামোয়। যদি এ নিয়মের কোনটির প্রয়োজন অচল ও শেষ হয়ে যায়, তবেই সমাজ তাকে ত্যাগ করবে কিন্তু তাও বিনা প্রশ্নে বা প্রতিবাদে নয়। কারণ অভ্যস্ত বিধি অচল হলেও, সহজে তাকে ত্যাগ করা দুরূহ। মার্থকে নিরস্ত করা যায় না। তার প্রশ্ন এল—এতকাল মঙ্গলকর পথ ও বিধি জেনে ও অবলম্বন করেও আমাদের সমাজে দুঃখ, অশান্তি ও ক্ষতির শেষ কোথায়? আদিমকালের মানব সমাজে, মানসিক যে ক্ষোভ ও দুঃখ ছিল তার পরিমাণ ও অনুভূতি এখন কি কিছু কম?' বললাম 'মার্থ এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যই আসেন বুদ্ধ ও ক্রাইষ্টের মত মহাপ্রাণরা। জান বুদ্ধকে ক্লেশ ও দুঃখ কি প্রশ্ন করায়?' তিনি বলেছিলেন, 'যার সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাই না, তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এবং যাকে ছাড়তে চাইনা তার বিচ্ছেদেই হয় দুঃখ ও ক্লেশ।' সমাজ মঙ্গলের পথ জানলেও বহু দিনের জমা অমঙ্গলের খাদ ছেড়ে উঠে আসতে পারে না। চেষ্টা করেও তাই সমাজ তৈরী হয় না, সঠিক এই মহামানবদের উপদেশকে অনুসরণ করে। সমাজের তৈরী ফ্রেমে যতক্ষণে তাঁদের মত ও নীতি ছেঁটে, কেটে, রাঙিয়ে, মানিয়ে, ধরে নেওয়া চলে, সেই টুকুই আসে মাত্র। তাই দুঃখের, ক্লেশের ও শোকের অন্ত মানব সমাজ কোনদিন দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।

সূর্যবিহীন দিনের আলো কম্‌তে কম্‌তে কখন যে সন্ধ্যার খোলা আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে আমরা লক্ষ্য করিনি। স্যেন্‌ নদীর বাঁধের দু' পাশের ও সেতুগুলির উপরের আলো জলে পড়ে, ছোট ছোট ঢেউগুলিকে সোনালী রূপালী রশ্মিতে রাঙিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌ছে। দু' একটা টাগ্‌ ঝিক্‌ ঝিক্‌ করে আকাশে ধোঁয়ার রেখা ফেলে চলে গেল। নদীর ওপারে লুভ্‌র্‌ প্রাসাদে আবছা সীমারেখা কুয়াশার যবনিকায় পড়ে যেন বিরাট একটি একোয়াটিন্‌ট্‌ প্রিনটের মতো দেখাচ্ছিল। আমার বেশ ভাল লাগে এই ঝাপসা ছবি। একে ব্যাক্‌গ্রাউন্ড করে আঁকা যায় মনের পটে কত নক্‌শা। সেগুলি ঠিক ফিল্‌মে ফ্যাশ্‌ব্যাকের মতন সাজিয়ে দেখা এবং শোনা চলে। পোঁ দেজার—সেতুর ওপারে লুভ্‌র্‌-এর দোতালায় গ্রাঁ গ্যালারির গবাক্ষগুলি যেন সহস্র বাতিদানের মুক্তাবৎ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কখনও বা নৃত্যক্লান্ত দম্পতীদের দু একজন বাতায়ন দ্বারে এসে দাঁড়াল। তাদের চলবার ও দাঁড়াবার ভঙ্গিতে নেই আধুনিক যুগের ব্যস্ততা। ধীর সে ছন্দ, আকাশে ভেসে যাওয়া শরতের মেঘের মতো। কানে এল যেন ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দীর সুরধ্বনি। সে সঙ্গীত ও তাদের গতিভঙ্গির ছন্দে সাবলীল। সে সুর ধারাকে রেপার্‌কাসান্‌ যন্ত্র ঘাত প্রতিঘাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল করেনি। কত যেন প্যালেস্ত্রিনা, ভিভাল্‌দি, লুলি প্রভৃতি সুরস্রষ্টাদের সঙ্গীত বাঁশরী ও বেহালার বিবিধযন্ত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রতি উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে আহ্বান করতে লাগল রসিকজনদের 'এস এস' বলে। মার্থকে বললাম 'জান মাদ্‌ময়জেল্‌, যবে থেকে রেপার্‌কাসান্‌ যন্ত্রগুলি সংগীতের রাজ্যে প্রবেশ করেছে, তবে থেকে সুর হয়ে গেছে বন্দী। এই যন্ত্রগুলি বংশী ও তন্ত্রীর অব্যাহত সুরধারাকে যেন বন্দীশালার ব্যারাকে পুরে জোর করে কুচকাওয়াজ করাচ্ছে। রেপার্‌ কাসানের ঢাক, ঝাঁঝর, কাঁসা, করতাল ইত্যাদি যেন সংগীতের তাল ও মাত্রাগুলিকে স্থূল অবয়ব দিয়ে ফেলে দেয়। তন্ত্রীময় যন্ত্রের এবং কাঠ, বাঁশ ও ধাতুময় বাঁশীর সুর উন্মথিত মোলায়েম সংগীত ধারার সামনে বাধা পেয়ে আছড়ে সে সুর সঙ্গীত ছিট্‌কে পড়ে। যেমন বম্‌ পড়লে লোকেরা নিজেদের খানে, আড়ালে ফেলে আত্মগোপনে নিজেদের নিরাপদের চেষ্টা করে তেমনি, রেপার্‌কাসানে ঠিক্‌রে পড়া বাঁশী বা বেহালার সুর যেন কোথায় লুকিয়ে যায়। রেপার্‌কাসানের ঝন্‌ঝনা মিলিয়ে গেলে আবার তারা যেন সাহস পেয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিক্ষিপ্ত সুরের ধারাগুলি আবার এসে

মিলে যায় সঙ্গীতের আসল স্রোতে। বহু ক্ষেত্রে তার দৌড় এগোয় না বেশীদূর। দামামা, ঝাঁঝর, কি করতাল গড়িয়ে দেয় তার সামনে দু-একটি তাল ও মাত্রার প্রস্তর কি ইঁট। আবার সুর ঠিক্‌রে ছিট্‌য়ে পড়ে—স্তব্ধ স্তিমিত হয় সঙ্গীতের স্রোত।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সংগীতকার প্যালেস্‌স্ত্রিনা, ভিভালদি, স্কার্‌লাতি প্রভৃতির সুর ধারায় রেপার্‌কাসানের অভ্যুদয় হয়নি বলে বড় প্রাণস্পর্শী সে রচনাগুলি। তখনকার দিনের লোকেদের অনুভূতির গভীরতা ও তীব্রতা যেন মনে হয়, এখনকার মানুষের চেয়ে সূক্ষ্ম-সংবেদন শক্তিতে ভরা ছিল। শতাব্দীর জড় করা, এগিয়ে চলার পথে কুড়োন শিল্প সম্পদ জমে আজকে শিল্প ও সঙ্গীতকে করে তুলেছে একটি কিউরিও শপ্‌। সেখানে যেন অতি প্রাচীন কলসাসের ধাতব ভাঙা মাথার খুলিতে ফুলদানী করে সাজান হয়েছে আজকের কেয়ারি করা কলমের ডাচ্‌ টিউলিপ। আর এর সমন্বয়কে বলা হচ্ছে আধুনিকতা। সে যুগের মানুষের স্বভাবে আচার ব্যবহারে ছিল না এতটা সভ্যতার 'ভিনিয়ার'। তাই তাদের ভালবাসা ও ঘৃণা হাসি ও কান্না, দান ও লুব্ধতা, দয়া ও ক্রূরতায় তফাতের দাঁড়ি বর্তমানের তুলনায় অতিশয় দীর্ঘ। তাদের বাঁচা মরায় বেশ একটা অভিনয় ও রহস্য ছিল—অন্ততঃ ইতিহাসের খাতায় তার যে ছাপ রয়ে গেছে তাতে সেই রকমই মনে হয়। আধুনিকতার সোরগোলে সাধারণের স্বকীয়তা হারিয়ে গেছে তাই ভায়োলিনকে ধাক্কা মারে ট্রম্‌বোন্‌ আর ট্রম্‌বোন্‌কে ধমক দেয় বিগ্‌-ড্রাম—ও বো-র কাঁদুনি ও ফ্লুটের ফুৎকার তলিয়ে যায় কাঁসর আর ট্রায়াঙ্গেলের ঝঞ্ঝায়; মনে হয়—কে যেন সুরের ডাষ্টবিন উল্টে ঢেলে দিয়েছে সঙ্গীতের আবর্জনা। মোৎসার্‌ত্‌ পর্যন্ত রেপার্‌-কাসান্‌, সুরের কুলীন সমাজে ছিল অপাংক্তেয়। বিতোফেন্‌ তুল্‌লেন তাকে জাতে আর ভাগ্‌-নার তার হাতে যষ্টি দিয়ে করে দিলেন সঙ্গীতের শাসক। তারপর থেকে তার উত্থিত যষ্টি তুলো ধুন্‌ছে সঙ্গীতের দেহে। আমাদের দেশের এক বিখ্যাত সুরকার গীতির রচনায় বলেছেন—

গীত কী সঙ্গীত মান
সঙ্গীত কি সুর মান
তাল মান মৃদঙ্গ
নৃত্য মান রম্ভা ॥

আমার মনে হয় রম্ভাকে নাচাতে গিয়ে মৃদঙ্গের তালে সুর ও সঙ্গীতের পড়ে গেছে হাতে ও পায়ে বেড়ী। সে বলল 'আমাদের চারপাশে ঘোলাটে ও আব্‌ছা হওয়ায় মনে হচ্ছে যেন আমরা একটা শ্যাম্পেনের গ্লাসে ডুবে গেছি, আর চারপাশে যে অসংখ্য বুদ্‌বুদের বিন্দু উঠে চলেছে তাদের পথ অনুসরণ করতে করতে হারিয়ে ফেলেছি সময়ের অগ্রপশ্চাৎ, ভুলে গিয়েছি জমির সীমানা—দৈর্ঘ ও প্রস্থ। রেপার্‌কাসানের বিরুদ্ধে তোমার এই তীব্র দোষারোপ শুনলে ভাগ্‌নার, বার্লিয়স্‌ কি হিন্‌ডেমিথ্‌-এর উপাসকরা তোমায় এই সামনের ল্যাম্পপোষ্টে 'লিন্‌চ্‌' করতে দ্বিধা বোধ করবে না।' বললাম আমাদের দেশের চলিত কথানুযায়ী তারা আমার হাড় খাক, মাস খাক, আর আমার চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাক কিন্তু তখন আমার কর্ণদ্বয় তো অব্যাহতি পাবে রেপার্‌কাসানের নির্দয় অত্যাচার থেকে।

রাস্তার ঠিক ওপারে ছিল একটি গ্রীক রেস্তোরাঁ। সেখান থেকে ভেসে এল সারেঙ্গী জাতীয় যন্ত্রের সঙ্গে অর্ধপ্রাচ্য উদাস সুরের রেশ। শুনে মার্থ বললে 'ঐ নাও তোমার রেপার্‌-কাসান্‌ মর্দিত কর্ণদ্বয়কে স্নিগ্ধ করতে সুরধারা ঢাল্‌ছে কলসাসের দেশের লোক।

আমি মনে মনে ইতিহাসের ছবির পর ছবি রাঙিয়ে চলেছি। মার্থ, আমি যে এতক্ষণ নীরব থেকেছি তার জন্যে কোন অনুযোগ করেনি। মনে হল, সেও কোন পুরনো দিনের কাহিনীর চওড়া বুলভার ধরে এগিয়ে গিয়েছে বহুদূর। সেখান থেকে আমার প্রতি তার নজর আর বোধহয় পৌঁছচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম, আমাদের জাগ্রত স্বপ্নের থেকে। দুটি ঘোলাটে রাঙা চোখ আর বিরাট একটি হাঁ-করা মুখ যার মধ্যে হলুদে কয়েকটা প্রায় মাড়ি বিচ্ছিন্ন খারাপ দাঁত; সেগুলোকে কাঁপিয়ে বেরিয়ে এল এক উৎকট শব্দ। 'বঁসোয়াঁর মাদাম, বঁসোয়াঁর মঁসিয়ো।' আমরা দুজনেই বুঝলাম এখানে বসে আমাদের আর আলাপ করা চলবে না। আগন্তুক মদ্যপানে বেশ নেশায় বিভোর হয়ে এসেছেন আমাদের সঙ্গে আসর জমাতে। আমাদের উঠতে দেখেই লোকটি বলল "উঠছ যে? আমি এলাম তোমাদের সঙ্গে বসে একটু গল্প করতে।" আমাদের অন্য কাজ আছে বলতেই সে সামনে হাতটা চিতিয়ে ধরে বললে, "আচ্ছা, যাবে যাও, তবে তোমাদের শুভকামনার জন্যে আমি কিছু বক্‌শিশ আশা করি। বেশী কিছু নয়— একপাত্র মদিরার দাম দিলেই চলবে।" আমরা তাকে এড়িয়ে, পাশ কাটিয়ে ডুবে গেলাম জনস্রোতে। মার্থ অস্ফুট স্বরে দিল লোকটার উদ্দেশ্যে একটা গালাগাল। বললাম, 'মার্থ, মাতালকে গালাগালি দিয়ে কি হবে?' সে বললে, মাতলামি করছে কিন্তু পয়সা চাইবার জ্ঞানটা খুব টনটনে আছে। হেসে বললাম, জানো—লোক মাতাল হলেও মগজের খানিকটা অংশ সহজ মানুষের মত সজাগ রেখে দেয়। এর প্রমাণ আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন একবার পেয়েছি।

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছিল একটা তাড়ি-খানা। সেখানকার খদ্দের বেশীর ভাগই ছিল বাজারের মাছবিক্রেতারা। তারা যখন পথ দিয়ে নেশায় টং হয়ে আবোল তাবোল গান গেয়ে চলতো, পাড়ার লোকে দু' একটা কটূক্তি ছাড়া তাদের এই উপদ্রব মোটামুটি সহ্য করে নিত। কিন্তু একদিন দেখা গেল একটি ভদ্র-সন্তান টল্‌তে টল্‌তে বেসুরো বেতালা আবোল তাবোল গাইতে গাইতে চলেছেন সেই পথ দিয়ে। পাড়ার একটি গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁকে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও খেলুড়ে ছেলের দল জড়ো হয়ে গেলাম তার চারপাশে। লোকটির গলায় ছিল চাদর। পাড়ার নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোক তার গলার চাদরটি সজোরে ধরে, রূঢ় ভাষায় তাকে জিগ্যেস করলেন যে, ভদ্রসন্তানের এই ইতর জনোচিত আচরণ কেন? নিজেকে এই রুষ্ট জনমণ্ডিত দেখে, মুহূর্তে মদ্যপের খামখেয়ালী ভাব ও প্রাণ খোলা সুর কোথায় উবে গেল। কিন্তু চকিতের মধ্যেই ফিরে এল তার নেশার ঘোর। সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ভদ্রলোকের চটি জোড়া পা'র থেকে তুলে নিয়ে নিজের মাথায় রাখলে আর বল্‌লে—'মশাই, ছিলুম বেচুরাম চাটুজ্জে আজ বড় দুঃখেই হয়ে গেছি 'শেখবেচু'।

অবশ্য মার্থকে প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিতে হল 'বেচুরাম চাটুজ্জে' ও 'শেখবেচু'র তফাতটা কোথায়। ভদ্রলোক ফের প্রশ্ন করলেন, 'আপনার 'শেখ বেচু' হবার কি দরকার ছিল?' তখন তার দুই গণ্ডের ধারায় প্লাবন এসে গেছে। সে বলল 'সাধে কি হয়েছি? আমার একমাত্র ছেলে, যখন সে চলে গেল তখন পারলুম না নিজেকে ধরে রাখতে বেচারাম চাটুজ্জে করে।' ভদ্রলোক অতি স্নেহে পাদুকা তার হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে তার মাথার ধুলোটি ঝেড়ে দিলেন। তাঁরও চোখে প্রায় জল এল। বললেন, 'ভাই এ পথ দিয়ে যখনই যাবে তুমি, বেচুরাম চাটুজ্জে কি শেখ বেচু যেভাবেই থাকো আমার সঙ্গে বসে দুটো মনের কথা বলে যেও।'

আমরা ছেলের দল একটু ব্যঙ্গ কৌতুক নাট্যোপভোগের আশা করেছিলাম কিন্তু এই বিয়োগান্ত অভিনয়ের আধিক্য দেখে কিছুটা ব্যাহত হয়ে চললাম খেলার মাঠে। আমি কিছুটা

এগিয়েই গিয়েছিলাম। পিছনে আসছিলেন টল্‌তে টল্‌তে, আবার থেমে-যাওয়া-সুরের মহড়া ভাঁজতে ভাঁজতে 'শেখ বেচু'। হঠাৎ শুনলাম তিনি আমায় ডাকছেন, 'ওহে ছোকরা, জলখাবারের পয়সা পেয়েছ? বললাম 'না'। বললেন তিনি 'কি রকম বাপ-মার ছেলে হে? জলখাবারের জন্য দুটো করে পয়সা পাও না দিন?' বললাম, 'থাকলেই বা দেব কেন?' শেখ বেচুর উত্তর এল, 'দাও হে দাও, আজকে আমার রোজকার বাঁধা মাত্রা থেকে কিছু কম পান করেছি। কাজেই মৌতাতটা ঠিক জমছে না।' সন্দেহ হল। একটু আগে যে লোকটি কেঁদে ককিয়ে বললো তার একমাত্র সন্তানের বিয়োগে সে আজ সব কিছু খুইয়ে হয়েছে 'শেখ বেচু', ঠিক যেন সেই লোকটির গলার স্বর এ নয়। জিগ্যেস করলাম, 'মশাই একটু আগে মরা ছেলের জন্যে কাঁদছিলেন আর এত শিগ্‌গীর তাকে ভুলে, ভাবছেন আপনার মৌতাতের কথা? শেখ বেচু হেসে বলল, 'আরে ঐ সময় আমার একমাত্র ছেলে বা মা যদি না মারা যেত তাহলে কি ঐখান থেকে এত সহজে ছাড়া পেতাম?'

আমরা এসে গেছি প্লাস্ স্যাঁমিশেলএ। ডান দিকে মাদাম পম্‌পাদুর্-এর অট্টালিকার শেষ অবশেষ তিনটি পাথরের খিলেন, তার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে একটি সরু গলিতে, নামতে হবে ছয়টি ধাপ। তারপরে একটি ডানদিকের রাস্তায় কোণে কয়েক শতাব্দীর পুরনো দুম্‌ড়ে পড়া ময়লা কালো একটি বাড়ী। তারই মধ্যে স্যাঁত্‌সেঁতে ছোট্ট একটি ঘরে আছে মার্থের মা কন্যার প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা করে। স্টোভে হয়ত চড়িয়েছে সুপ্।

আমরা পৌঁছলুম। জানি অনুরোধ করবে একবাটি সুপ্ খাবার জন্যে। গরম ঘোলাটে সুপ্—তাতে কয়েক টুকরো মাংস আর টোস্টকরা কয়েকখণ্ড রুটি ভাসছে। তারা গরীব কিন্তু তাদের এই আতিথেয়তার অভিব্যক্তি ধনীর আমন্ত্রণের প্রাচুর্যকে লজ্জা দেবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিশু পত্রিকা

অগ্নিমা সেন

সাধারণ পত্রিকার মধ্যে শিশু বিভাগ

গত বৎসর রবিবারের 'যুগান্তর' পত্রিকায় **। বাংলার শিশু সাময়িক 'পত্রিকার' আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীবিনায়ক সেন এক জায়গায় বলেছেন "বয়স্কদের কাগজে ছেলেদের বিভাগ যোজনা করবার পুরোধা 'প্রবাসী'। বহুদিন পূর্বে প্রবাসীতে 'ছেলেদের পাতা'ড়ি নামে শিশুদের জন্য কয়েকখানি পৃষ্ঠা থাকতো।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষে বাংলা সংবাদ পত্রিকার আবির্ভাব হয়। বর্তমানে সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকার আকার ও প্রকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু ১৮৬৮ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে 'অমৃত বাজার পত্রিকার জন্ম হইবার পূর্ব পর্যন্ত মাসিক পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতে সংবাদ ও সাহিত্য একই কাগজে প্রকাশিত হইত; এবং এই বিষয় বস্তুর পার্শ্বে শিশুদের জন্যও একটু স্থান থাকিত। অবশ্য বর্তমানে মাসিক সাপ্তাহিক, বা দৈনিক কাগজে পৃথকভাবে নানারূপ নাম দিয়া শিশু মহল সৃষ্টি হইয়াছে। এই পৃথকভাবে শিশু মহল সৃষ্টির 'পুরোধা প্রবাসী' হইতে পারে। কিন্তু এই মহলের ভিত্ পত্তন করিয়াছিল বাংলার প্রথম সাময়িক পত্রিকা 'দিক্ দর্শন'। ইহার জন্ম ১৮১৮ সনে। এই প্রথম পত্রিকাতে বয়স্কদের বিষয় বস্তুর সঙ্গে শিশু বিভাগ ওতপ্রোতঃ ভাবে জড়িত ছিল। তবে বর্তমানে যেমন মাসিক কিংবা সাপ্তাহিক পত্রিকায় শিশুদের জন্য একটা পৃথক বিভাগ থাকে তখন সেরূপ কোন পৃথক বিভাগ ছিল না। বয়স্কদের বিষয় বস্তুর মধ্যে মধ্যে শিশু বিষয়ক বস্তু প্রকাশিত হইত। ইহাতে শিশুদের আনন্দদায়ক গল্প, বৈজ্ঞানিক বিষয়-বস্তুর আলোচনা ও সংগৃহীত নানা উপদেশ থাকিত। জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক এই পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন। স্কুলের পাঠ্য হিসাবে এই মাসিক পত্রের উপযোগিতা অনুভব করিয়া স্কুল বুক সোসাইটি ইহার বহু খণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন। এই পত্রিকার বহু সংখ্যার ইংরাজী সংস্করণ হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক আলোচনার নমুনা —

পৃথিবীর আকর্ষণের বিবরণ

গোপাল ঃ— বৃক্ষ হইতে কি কারণ ফল পড়ে।

কালিদাস ঃ— আমি শুনিয়াছি যে ইংলণ্ডের মহাজ্যোতির্বিৎ নিউটন বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতে দেখিয়া নানা বিতর্ক দ্বারা পৃথিবীর যথার্থ ব্যবস্থা স্থির করিলেন।

গোঃ— ফলের পতনের আশ্চর্য্য কি।

কাঃ — ইহাতে কিছু আশ্চর্য্য ছিল না কিন্তু তিনি দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

'বিদ্যাকল্পদ্রুম' ১৮৪৬ সনের জানুয়ারী মাসে (২৬শে জানুয়ারী) ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাকল্পদ্রুম অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক রচনা — শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার ইংরাজী নাম Encyclopaedia Bengalensis তিন মাস ব্যবধানে প্রকাশিত বিদ্যাকল্পদ্রুমের প্রত্যেক কাণ্ডের তিনটী করিয়া সংস্করণ —

ইংরাজী, বাংলা, বাংলা ও দ্বাত্রোপযোগী বাংলা মুদ্রিত হইত। ইহার সর্বসমেত তেরটি কাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১০ কাণ্ডে (ইং ১৮৪৯) শিশু মনোরঞ্জক নীতি বোধক ইতিহাস (রাজদূত এবং সরলতার পুরস্কার নামক গল্প) প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পের নমুনা ঃ—

পূর্বকালে হিমালয় শিখরি তলস্থ পার্বতীয় দেশে কতিপয় ভূপালের বসতি ছিল। তাহারা চৌবিংশি রাজা নামে বিখ্যাত হইয়া চতুর্বিংশতি ক্ষুদ্র ২ রাজ্য শাসন করিতেন . . । উক্ত চতুর্বিংশতি রাজশ্রেণীর মধ্যে এক ভূপতি প্রবল প্রতাপ ও সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন তিনি গোরক্ষ জাতিকে উত্তরোত্তর পরাক্রমশালী হইতে দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে শঙ্কা করিতে লাগিলেন যে এই বিজিগীষু লোকেরা ক্রমশঃ সর্বত্র আপনাদের জয়-পতাকা বিস্তার করিবে ফলে ও তাহারা পরে হিমালয়ের দক্ষিণ প্রান্তস্থ তাবৎ দেশ ব্যাপিয়া আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল।. . .

সুলভ সমাচার — ১লা অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (ইং ১৮৬০) সাপ্তাহিক ভাবে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত সংস্কার সভা হইতে এই উৎকৃষ্ট পত্রিকাখানি প্রচারিত হয়। হিতোপদেশ, নানা সংবাদ, আমোদজনক ভাল ভাল গল্প আমাদের দেশের এবং বিদেশের ইতিহাস, বড় বড় লোকের জীবনী এবং বিজ্ঞানের মূল সত্য (যতদূর সহজ কথায় লেখা যাইতে পারে) এই পত্রিকার বিষয় বস্তু ছিল। মাত্র ১ পয়সা মূল্যে প্রচারিত হইত। ১৮৮৬ সনের ২৭এ আগষ্ট (১৬ খণ্ড, ১ম সংখ্যা) ইহা কুশদহ ও ভৈরির সহিত সম্মিলিত হইয়া — 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' নাম ধারণ করে। পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল জীবিত ছিল। নব পর্যায়ে 'সুলভ সমাচার নরেন্দ্রনাথ সেন দ্বারা দৈনিকরূপে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশ কাল— ১লা বৈশাখ ১৩১৮ সন। ইহার পরমায়ু এক বৎসর।

আমোদজনক গল্পের নমুনা—

এক ধর্মভীত রাজা রাজ বাটীর দরজায় একটি ঘণ্টা টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন যে যাহার কোন নালিশ থাকিবে সে ব্যক্তি আসিয়া একবারে ঘণ্টা নাড়িবে; এবং তিনি অমনি তাহার খবর করিবেন; . . . . ঘোড়াটি একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে রাজবাটীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল। বিচলির দড়ির দিকে হঠাৎ তাহার চোখ পড়াতে সে আর লোভ সামলাইতে পারিল না এবং কণ্ঠে সুদ্ধে দরজার ভিতর ঢুকিয়া সেই দড়ি গাছটি চিবুতে আরম্ভ করিল, চিবুনের জোরে ঘণ্টা ঢন্ ঢন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।. . .

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিত পত্রিকা (মাসিক) ১২৬২ সালের (১৮৫৫, সেপ্টেম্বর) মাসে নবীনচন্দ্র আঢ্যের সম্পাদনায় এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল নীতিবিদ্যা শিক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সার বিবরণ এবং সে সমস্ত বিষয়ের আন্দো-

---

* ১৩৬৪ সালের আষাঢ় মাসের সমকালীন পত্রিকায় একান্তভাবে শিশু পত্রিকাগুলির ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে।

** রবিবার ১লা আষাঢ় ১৩৬৪ (২৬শে জৈষ্ঠ্য) ১৬ই জুন ১৯৫৭।

লনে জ্ঞান ও স্বভাব বৃদ্ধি এবং যাহাতে সাধারণের উপকার সম্ভাবনা তাহার সংক্ষেপ কথা থাকিত।

বঙ্গ বিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকার প্রথম সংখ্যার (আশ্বিন ১২৬২) নির্ঘণ্ট :—

ভূমিকা, ঈশ্বরতত্ত্ব, বিদ্যানুশীলন, বাণিজ্য, রাজত্ব, নীতি, উষ্ট্র হিতকথা পদ্য। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা 'সুবর্ণ বণিক সমাচার' (৫ম ৮ম বর্ষ ১৮৫৮—১৮৬৮) বঙ্গ বিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন।

এই পত্রিকাতে দশকুমার চরিতের অন্তর্গত অপহার বর্মচরিত, আরব্য উপন্যাস ও পারস্য উপন্যাস (গোল বেসেনুয়া) ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। গোল বেসেনুয়া শেষার্ধ অংশ দ্বারকানাথ কুণ্ডু প্রণীত ১২৬২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য ।

উপযুক্ত পত্রিকা সমূহের মাধ্যমে সেকালের শিশু-সাহিত্যের ধারাটি সুপুষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। বয়স্কদের সাথে একই আসরে শিশুদের জন্য যে রসবস্তু পরিবেশিত হইত তাহাতে আজিকার দিনে বিস্ময় সঞ্চার করিলেও তাহা যে অসুবিধার সৃষ্টি করে নাই বা শিশুসাহিত্যের সরস আঙিনাকে মাধুর্যের অনাস্বাদিত রসে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেকালের পত্রিকাগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পরবর্তীকালের শিশুসাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া আমাদের চিরকালীন ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

— একটু বোস।

বাইরে এসে সোজা নীচে নেমে আসে। কলঘরের সামনে এসে দেখে দোড়ঢো ভেজান।

— কে ভাই ভেতরে ?

— আমি গো ! — কমলির মায়ের গলা।

মৃগনয়নী বলে,—একটু সকাল সকাল যদি বেরোন ভাই, আমার কর্তা এখুনী বেরোবেন।

—পাটটে দাও না। ত্যাতক্ষণে আমার হয়ে যাবে।

মৃগনয়নী ওপরে গিয়ে বনবিহারীকে স্নানের জন্যে নীচে পাঠিয়ে দেয়। কমলিকে দিয়ে দুটো সন্দেশ আনিয়ে রাখে বনবিহারীর জন্যে। জল খাইয়ে বনবিহারীকে অপিসে রওনা করিয়ে দিয়ে কোমরে এঁটে সেঁটে আঁচল খানা জড়িয়ে নেয়। বালতী বালতী জল এনে ঘর ধুতে হবে, জিনিষ পত্র গুছোতে হবে, উনুন পাততে হবে, আশে পাশের ভাড়াটেদের সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা বলে বশে রাখতে হবে। অনেক কাজ। কাজের সুরু হোল। কমলি মেয়েটা এসে খোকাকে ডেকে নিয়ে যায়, আদর করে। মেয়েটা বেশ গায়ে পড়া। আলাপী। বেশ নাকে মুখে কথা ঠোয়স। আসার পর থেকে কমলি ত কবার এলো ওর ঘরে। ছেলেটাকে যদি কিছুক্ষণ ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখতে পারে কমলি, তবে এই ফাঁকে কাজগুলো সব সেরে নিতে পারে মৃগনয়নী। তাই দেবে। কাজে লেগে যায় মৃগনয়নী। নীচের থেকে বড় বালতী ভরে জল আনতে একটুও কষ্ট হয় না ওর। শুধু ওর চওড়া পুষ্ট হাতখানার শিরাগুলো ফুলে ফুলে ওঠে। টিকালো নাকের পাতাদুটি ফুলে ওঠে এক ভবিষ্যত প্রতিজ্ঞার দীপ্তিতে। সংসারে সে কিছুতেই হারবে না। কেউ তাকে হারাতে পারবে না। সব সে একা করবে। একা। এক ক্ষীণজীবি সঙ্গী নিয়ে পথ সে চলবে। তার হাতখানা ধরে তাকে বুকের কাছে আগলে নিয়ে ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে অনেক চোখের ভেতরে বসেও সে ভয় পাবে না। ভয় করতে মৃগনয়নী জানে না। এইটেই রামতারণের সবচেয়ে বড় দান। এতবড় দান আর কোথাও পায়নি মৃগনয়নী। এ সম্পদ হারায় না। কখনও হারাবে না।

আঠারো

সুনিপুণ হাতে বাসা বেঁধেছে মৃগনয়নী। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। মাস তিনেক কেটে গেল। এর ভেতর সংসার চালিয়ে কত জিনিষ যে মৃগনয়নী কিনেছে বনবিহারীও জানে না। বনবিহারী টাকা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। টাকা পেয়ে চিন্তা সুরু হয় মৃগনয়নীর। এ মাসে বড় একটি কাঁসার থালা কিনতেই হবে বনবিহারীর জন্যে, আর কমলের একটি ছোট গেলাস। ছেলের নাম রেখেছে কমল। তাছাড়া বাসন মাজা ঘর ধোবার একটি ঝি রাখতে হবে। রাখত না মৃগনয়নী, কিন্তু পেটে আর একটি ছোট্ট প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে। খুব সকালে উঠতে ইচ্ছে হয় না। সন্ধ্যে হলেই বমি-বমি লাগে। একটি ঠিকে ঝি না হলে আর চলে না। ভবানীর মাকে একটি ঝিয়ের কথা বলতে হবে। বলতে হবে ডাক্তারের বউ বাঁণাকে। সবচেয়ে ভাল হয় একবার বিভার মায়ের কাছে গেলে। বিকেলে বেড়াতে যাবে ওখানে। বনবিহারী আসবে সন্ধ্যার পর।

তার আগেই ফিরে আসা যাবে। কমলকে নিয়ে একটু গড়াতে গড়াতে রোদ পড়ে আসে। একা একা ঘরে শুয়ে কত কথাই যে মনে হয় মৃগনয়নীর। কালো বৌ একদিনও এলো এ বাড়ীতে। নতুন বৌ ত নয়ই। একই অপিসে কাজ করে দু-ভাই। শুনেছে, ভাল করে কথা বলে না কেউ কারো সঙ্গে।

বনবিহারী নাকি কথা বলতে গিয়েছিল দুএকবার। মেজদা কথা না বলায় ও আর সেধে কথা বলেনি। কাজের ব্যাপারে কোন প্রয়োজন হলে বড়বাবুর মারফত কথাবার্তা হয়।

জিজ্ঞেস করেছিল মৃগনয়নী — তুমিত ক্যাশের কাজ করো। তোমার কাছে ত আসতেই হবে।

— আমি ডাকি না। বেয়ারা দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিই ভাউচার শুদ্ধু।

— ভাউচার কি ?

— মানে রসিদ। —বনবিহারী মৃগনয়নীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

— সায়েব কাকে বেশী ভালবাসে জান ?

— কাকে ? — বলে মৃগনয়নী।

— আমাকেই। ক্লার্ক সায়েবত আমায় পাগলা বাবু বলে ডাকে।

মৃগনয়নী হেসে ওঠে,—ঠিকই বলে। বনবিহারীও হাসে। আশ্চর্য দাদার সঙ্গে মনোমালিন্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। একটুও বেদনা নেই। সংসারে ভালবাসা কত সহজেই না ভুল হয়ে যায় !

— কালো বৌঠান কিন্তু একদিনও এলো না ? হঠাৎ হয়ত কখনও কখনও বলে বসে বনবিহারী। মৃগনয়নী বলে,— আমিও ঠিক বুঝি না কেন এলো না।

— একদিন নেমন্তন্ন করলে কেমন হয় !

— করতে পারো। তবে আমার মনে হয় আসবে না। সবই সমান।

বনবিহারী একটু চুপ করে থেকে হয়ত বলে,—না, কালো বৌঠান তেমন হতেই পারে না। আমার মনে হয়, ওকে আসতে দেয় না।

— কে ?

— নতুন বৌ।

মৃগনয়নী লক্ষ্য করে কালো বৌ সম্বন্ধে বনবিহারীর দুর্বলতা এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। একটু থেমে হয়ত। মৃগনয়নী কথা পালটায়,—সামনের মাসে অম্বুবাচী। মাকে কিছু টাকা পাঠাবে না ?

— কি লাভ পাঠিয়ে ?

— কেন ?

— সামনের মাসে বোধহয় ওরা সব আসছে।

বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে মৃগনয়নীর।— তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। দাদা আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বড়বাবুকে বলছিল।

চুপ করে থাকে মৃগনয়নী। চুপ করে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবে। অনেকক্ষণ পরে বলে,—তবে এই মাসেই না হয় গোটা দশেক টাকা পাঠিয়ে দাও।

— এ মাসে টাকা কই ?

— সে আমি বুঝব খন। তুমি পাঠিয়ে দাও।

বনবিহারীকে দিয়ে জোর করে দশটা টাকা পাঠিয়েছিল মৃগনয়নী। সংসারও চলছে বেশ

ভালভাবেই দেখেশুনে বনবিহারী নিশ্চিন্ত। এ মাসেও তাই মাইনের সব টাকা দিয়ে দিয়েছে মৃগনয়নীর হাতে।

দুপুরে গড়াতে গড়াতে ভাবছিল মৃগনয়নী। সে যখন আঁতুড়ে যাবে তখন সংসার চলবে কি করে ? পুঁটিদিকে যদি কোনরকমে আনান যায় এখানে। তা কি সম্ভব হবে ? মাকে কাল একখানা চিঠি লিখবে মৃগনয়নী। তরঙ্গিনীর কি হোল কে জানে ? কোন খবরই ত' পাওয়া গেল না। দিদির খবরটা চেয়ে পাঠাতে হবে। দিদির জন্যে মাঝে মাঝে মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সেই ডাগর চোখ দুটোয় গভীর হতাশার ভেতরেও প্রতিজ্ঞার দীপ্তি। দিদির মত আর কাউকে দেখলাম না। অমন মেয়ে যেখানে সেখানে মেলে না। যদি কখনও আর একখানা ঘর ভাড়া নিতে ও পারে। দিদিকে এনে নিজের কাছে রাখবে। যতদিন থাকতে চায়। কিন্তু ? দিদির প্রতি একটা নিষ্ঠুর ঘৃণার ভাব দেখা দেয় মনের সচেতনতার অলক্ষ্যে। দিদিকে সে ঘৃণাও করে। দিদির জন্যে কান্নাও পায়। নিজেকে নিজে আর বুঝে উঠতে পারে না মৃগনয়নী। যাকগে। উঠে পড়ে মৃগনয়নী। বিভার মায়ের কাছে একবার যেতে হবে। ঘর ভাড়াটা দিয়ে আসতে হবে আর ঠিকে ঝিয়ের কথাও বলতে হবে। গলিটা মোড় থেকে রোদ গিয়ে উঠেছে ওই বড় বাড়ীটার ছাদের কুঠুরীটার দেয়ালে। বেলা গড়িয়ে গেছে। নিস্তব্ধ গলিটা মুখর হয়ে উঠছে ক্রমশ ফেরিওয়ালাদের ডাকাডাকিতে। সাবান তরল আলতা চাই—দাঁত ভাল করবে—পাঁঠার ঘুগনী-ই-ই-ই-ই ! কত রকমারি সুরে রকমারী আবেদন। সাড়া মেলে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের কাছ থেকে। বেলা বেশ পড়ে এলো।।

মৃগনয়নী উঠে দু বালতী জল তুলতে যায় কলতলায়।

কলতলায় কমলির মা। যখনই কলে আসে—তখনই কমলির মা। এর বোধহয় জল-বাই আছে।

—একটু সরবে ভাই। জল তুলে নেব দুবালতী।

কমলির মায়ের গলাটা অত্যন্ত কর্কশ আর সরু। মুখটা বাড়িয়ে বলে,—তুমি কি ঠিক আমার পেছু লেগে থাকবে বাছা। য্যাখন আসব, ত্যাখনই তোমার রূপ দেক্খে যাবে !

— বিভার মায়ের ওখানে যাব। একটু তাড়া আছে তাই।— একটু হেসে বলে মৃগনয়নী।

কমলির মা সমান গলায় বলে,—তোমার তাড়া। কাক না ডাকতে তোমার ভাতারের তাড়া। তাড়ায় তাড়ায় যে জ্বইলে দিলে বাছা ! মৃগনয়নীর মনে মনে খুব হাসি পায়। বাইরে হাসিটা চেপে বলে,—শোন, বলতে ভুলে গেছি কমলি আজ রাত্তিরে আমার ঘরে খাবে।

— তা বেশ ত'। এর আর বলাবলি কি। এইবারে নরম হয়ে এসেছে কমলির মা। কলতলাটাও ছেড়ে দেয় তাড়াতাড়ি। মানুষটার জন্যে কষ্ট হয় মৃগনয়নীর। কলের মুখে বালতিটা পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে কি কপাল এই কমলির মায়ের ! কমলির দিদিমার কাছেই কথাটা শোনা। স্বামী দেশত্যাগী হয়েছে আজ প্রায় সাড়ে ষোল বছর। বিয়ের বছর দুয়েক পরেই। কারণটা ঠিক জানা যায় না। এইটুকু বোঝা ওর দিদিমার কথা থেকে। বিয়ের সময় কমলির মা ছিল বড্ড রোগা আর এত ক্ষীণজিবী যে আঙুল দিয়ে ঠেললে পড়ে যেত। বিয়ের পর মাঝে মাঝে রাত্তিরে ভীরমি খেতে আরম্ভ হোল। দুএক দিন রাত্তিরে চীৎকার করেও উঠত। একদিন পেলয় কাণ্ড ! মানে সেদিন রাত্তিরে নাকি কমলির মা ওর স্বামীর গলা টিপে ধরেছিল। কথাটা কমলির দিদিমা খোলাসা করে বলেনি। এটা বলেছিল, ভবানীর মা।

— আমাদের দেখ্তাই।

— তাই নাকি ?

হাঁ গো ! সে হৈ হৈ কান্ড। পুরুষ মানুষ অত সইবে কেন ? আদর যত্ন দিয়ে রেখে রাখতে হবেনি ? ব্যস্। সেইত বেইরে গেল।

যে জন্যেই বেরিয়ে যাক, কমলির মায়ের বরাতের কথা ভেবে লাগে মৃগনয়নীর। না বললে ছেড়ে যাওয়া ত' খুবই সহজ, বনিয়ে থাকাটাই ত' কঠিন। কমলির মা নিজেও খুব খুলেছিলো একদিন মাত্র। কথাটা হচ্ছিল ভবানীর মায়ের সামনেই। বললে,— দোষ কি মানুষ করে না ? তাই বলে একবারে ইয়ে ? এখন থাকলে কি তেমন ধারা হোত! কোথায় যে চলে গেল। স্পষ্টই দেখল মৃগনয়নী চোখের কস্ বেয়ে তপ্ত জলের ধারা। ভবানীর মা মুচকি হেসে একটু টিপলে মৃগনয়নীকে, অর্থাৎ আদিখ্যেতা দেখ। মৃগনয়নীর কিন্তু ভাল লাগেনি ভবানীর মায়ের ভাবখানা। কমলির মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল,—কোথায় আছে জান ?

— তা আর জানব নি ? হারাণ তান্তিক ভূত চাইলে বলে দিলে। আমাদের দেশের তান্তিক। শ্মশানে মশানে গিয়ে কত কি করলে, যাগযজ্ঞি ঝাড় ফুঁক। তারপর সবই বলে দিলে।

— কি বললে ?

— পশ্চিমের একটা সহরে আছে। আবার বিয়ে করেছে। ছেলে হয়েছে তিনটে। তবে ভাল নেই। খুব অশান্তিতে আছে। খুব ভুগছে।

এইবার যেন একটু হাসি এলো কমলির মায়ের মুখে। আশ্চর্য! মৃগনয়নী ভেবে অবাক হয়েছে, একজন খুব কষ্ট পাচ্ছে ভেবেই আরাম। কি কুৎসিত আরাম। আর কথা বলতে ইচ্ছে হয়নি মৃগনয়নীর। বালতি দুটো ভরে ওপরে চলে এলো মৃগনয়নী। ঘর ঝাঁট দিয়ে উনুনে ঘুঁটে কয়লা সাজিয়ে সাড়ী বদলে এই বার বিভার মায়ের ওখানে চলল মৃগনয়নী। আঁচল বেঁধে নিলে ভাড়ার টাকা। মনে মনে ঠিক করে নিলে সন্ধ্যের আগেই ফিরতে হবে। বনবিহারী দিনে বনবিহারী খায় না। কোন মতে সেম্ধ ভাজাভুজি দিয়ে চালায় মৃগনয়নী। রাতের রান্নাটা বেশ জুত করে করতে হয়। ভাল মাছ বনবিহারী আনবেই। রাত্রে একটু সস্তায় মেলে। সবচেয়ে সেরা মাছ আনে বনবিহারী। সস্তায় খারাপ জিনিষ ও আনতে পারে না। বাজারের সেরা পটল, সেরা আম, ভাল মাছ, এ সব আনা চাই। না খেলে আর রোজগার করছি কেন বলো। কথাটা শুনতে ভালই লাগে মৃগনয়নীর। তবু বলে দু-চারবার একটু গলা উঁচু করে যাতে বাড়ীর আর সবাইও শুনতে পায়। কি দরকার ছিল এত দাম দিয়ে পটল আনবার। কি যে করো। ল্যাংড়া আমও এতগুলো আনবার দরকার ছিল না। কমল খাবে ঠিকই। কটা আর খাবে ? সবাই শুনুল কথাটা—এও এক আনন্দ। ও মনে মনে বোঝে যে ওযে ভাল খেতে পরতে পায় এটা সবাইকে শোনানটা মোটেই ভাল নয়। তবু মৃগনয়নী যে মেয়েমানুষ! পরে ভাবলে হাসি পায়। নিজের ওপর নিজের বিরক্তি আসে। এতক্ষণে বিভার মায়ের ঘরের সামনে এলো মৃগনয়নী। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকতে যাবে। বিভার মা কাছে এসে চোখ বড় বড় করে ঠোঁটে আঙুল রেখে বললে,—চুপ! মৃগনয়নী চমকে উঠেছে ভয়ে,—কি হোল ? বিভার মায়ের মুখখানা কাগজের মত সাদা। মৃগনয়নীকে বারান্দার শেষ সীমানায় টেনে নিয়ে এলো। মৃগনয়নীর বুকের ভেতরটা কাঁপছে।

— কি হোল, অমন করছেন কেন ?

— বাবু।

— কি হয়েছে ?

— বাবু ওই পাশের ঘরে খিল বন্ধ করেছে, বিভাও আছে।

বিভা ওর আগের স্বামীর মেয়ে। বয়েস প্রায় ষোল।

—তাতে কি হয়েছে।

বিভার মায়ের গলা ধরে আসে। ঠিক গুছিয়ে বলতে পারে না,—মানে, ওঘরে চাবুক আছে কিনা। খুব সরু চাবুক। মৃগনয়নী জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে।

— বুঝলেন না ? একটু পরেই শুনবেন বিভার গোঙানী, মারবে ওকে। মাঝে মাঝে মরে।

মৃগনয়নী স্তম্ভিত হয়ে যায়। লোকটা কি পাগল ? সাঁই করে একটা আওয়াজ! মাগো! —চাপা কণ্ঠস্বর। বিভারই ত' ?

— শুনছেন ?—বিভার মায়ের চোখ দুটোয় কোন ভাষা নেই, দৃষ্টি নেই, পৃথিবী ওলট-পালট হচ্ছে সেখানে।

আবার চাবুকের আওয়াজ। আবার! মরে গেলুম মা! মাগো!—আবার চাপা আর্তনাদ। চীৎকার করবার হুকুম নেই বোধকরি। মৃগনয়নী একি শুনছে। একি দেখছে। মৃগনয়নীর কপাল ঘেমে ওঠে। নাকের ডগা ঘেমে ওঠে। বিভার মা মুখে আঁচল চাপা দিয়েছে। একটু পরে আবার চুপচাপ। বিভার মা ফিস্‌ফিস্ করে বলছে।—মদ খেয়ে ফিরেছে। মদ খেলে মানুষ এমন হয়! মৃগনয়নীর বুকে কাঁপুনি তখনও থামেনি। কিন্তু বিভাকে মারবার কি কারণ ? মোল বছরের ডাগর মেয়ে! বিভার মা বলছে তখনও।—জানেন না বুঝি, বিভার নিজের বাপ নয়! তাহলে কি এমন করে মারতে পারত। বিভার মা অদ্ভুত। নিজের কলঙ্কের কথা নিজে এমন সহজ হয়ে সহজ করে বলতে আর কাউকে দেখেনি মৃগনয়নী। ছেলে মানুষের মত সরল চাউনি। মৃগনয়নীর আর ভাল লাগছে না। এবার চলে যাবে।

— নিন, ভাড়ার টাকাটা নিন।

বিভার মা টাকাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। যাবার আগে মৃগনয়নী বললে,—আচ্ছা বিভাকে কেন মারে বলুন ত' ?

— কেন ?

— হ্যাঁ, অতবড় মেয়ে ওর গায়ে হাত দেয়া কি ভাল ?

বিভার মা স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে থাকে।

— এমন করে চাবুক মারা। ছি, ছি! কেন মারে ?

বিভার মা চোখদুটো তুলে তাকায়। চোখদুটো বর্ষায় ভেজা কাঁচের মত ভিজে। জল ভরে ওঠে।

— কেন মারে ? মারবেই ত'। যা বলে তা শোনে না।

—কি শোনে না ?

— কি শোনে না ?

— জানি না।— বলে বিভার মা মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

মুখ ঘুরিয়ে নিলেও দেখা যায় গাল বেয়ে জল পড়ছে এবার। অনর্গল। মৃগনয়নী নিজেই লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে। মনটা ভার। অনেক বেদনার সাক্ষী হয়ে চলেছে মৃগনয়নী।

শ্লথ পায়ে, নিজের ঘরে ঢোকে। শরীরটার ভেতর কেমন করতে থাকে। শুয়ে পড়ে মৃগনয়নী।

কমলি আসে। কমলকে কাছে দিয়ে যায়।

—ও আর থাকছে না মাসীমা।

কমলির দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না মৃগনয়নী। বিভার মায়ের জলে ভেজা মুখখানা তখনও চোখের সামনে ভাসছে। হয়ত ভেবেছিল স্বামীর ঘর ছেড়ে এসে শান্তি পাবে কিন্তু কই, এখানেও সেই অশান্তি। আবার কি এ ঘরও ছাড়বে বিভার মা? না আর বোধহয় নয়। সংসারের কতকগুলো সুকঠিন শিক্ষা বোধহয় এদেরই হয়। কালে, কত কালে কে জানে তবু কোন এক সময় বিভার মা খাঁটি হয়ে উঠবে। সংসারটাকে ওর মত করে কটা মেয়েই বা দেখতে পায়? ধীরেনবাবুর কথা একদিন জিজ্ঞেস করবে ওকে। ওদের ভালবাসার কথা একদিন জিজ্ঞেস করবে ওকে। ওদের ভালবাসার কথা জানতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু এমন ইচ্ছে ত' ভাল নয়। খারাপটাই বা কি? নিছক কৌতূহল ছাড়া ত' আর কিছু নয়। তবু একবার বনবিহারীকে জিজ্ঞেস করে সব কথা জানিয়ে যাওয়া ভাল। ভাবতে ভাবতে চোখদুটো বুজে আসে। তখনই মনে হয় ঘমুলে চলবে না। রান্না রয়েছে। ভাবতে ভাবতেই একটু বেলায় ঘুমিয়েই পড়ে মৃগনয়নী। কতক্ষণ গেছে কে জানে। হঠাৎ পায়ের একটা ঠোক্কর খেয়ে চমকে চোখ মেলে মৃগনয়নী।

— কে?

একি! সে কি স্বপ্ন দেখছে! আবার একটা পায়ের ঠোক্কর। এবার আরও জোরে কোমরে। আরও জোরে লাগলে হয়ত বা—। পেটের সন্তানটার কি হোত কে জানে। আচমকা আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যায় মৃগনয়নী।

— তুমি! একি!— উঠে দাঁড়ায় ও।

বনবিহারী পাশে দাঁড়িয়ে টলছে। চোখদুটো রাঙা। চোখের পাতা টানছে। ভাল করে তাকাতেও পাচ্ছে না। মুখের কাছে দাঁড়াতেই বিশ্রী গন্ধ পায় মৃগনয়নী।

— তুমি! মদ খেয়েছ? — গলা বন্ধ হয়ে আসে ওর।

বনবিহারীর কথাগুলো অস্পষ্ট। তবু বেশ জোরালো করে বলবার চেষ্টা করে,—আর সন্দে বেলা ঘুমিয়ে ঘরে অলক্ষী ধরাবে! ও সব চলবে না। ঘাড় ধরে বার করে দেব। মৃগনয়নী কি আর বলবে! ওর হাত ধরতে যায়।

— ছুঁবি না। খবদ্দার। অলক্ষীর মত ঘুমোচ্ছে ঃ বাতাস কর। মদ দে আরও।

মৃগনয়নী তাড়াতাড়ি গিয়ে দোরটা বন্ধ করে দেয়। ছি, ছি! ওর নিজের মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। বিভার মায়ের সঙ্গে আর তার কি প্রভেদ রইল। বনবিহারীর চাবুকটা হাতে নেয় বাকী। হাত পা কাঁপছে মৃগনয়নীর। তবু সাহস করে কাছে আসে। গায়ে হাত দেয়। হাত বসায় বনবিহারীকে।

—ছুঁবি না।— আবার একবার গর্জে ওঠে বনবিহারী।

— তোমার পায়ে পড়ি। চেঁচিও না। — গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। অশ্রুর বেগ আর বুঝি সামলাতে পারে না।

বনবিহারীর জুতো খুলে দেয়। জামা খুলে দেয়। ঘেমে গেছে একেবারে। পাখা নিয়ে বাতাস করে। কমল ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। কমলকে ঘর থেকে বার করে দেয়। ভেতরে এসে বনবিহারীকে শুইয়ে দেয়। বনবিহারী একদৃষ্টে তাকিয়েছিল মৃগনয়নীর দিকে। এবার গলাটা একটু নরম।—মদ খেলুম কেন জান? খুব অবাক হচ্ছ, না? মদ খেয়ে আনন্দে। একটা মস্ত স্যালভেজ হয়েছে। মানে পাটের স্যালভেজ। মৃগনয়নী চুপ করেই শোনে।

— এ স্যালভেজে হাজার টাকা উপরী আমার কে মারে! আজই পেয়েছি দেড়শ টাকা উপরী। পকেটে আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? পকেট দ্যাখ! মাইরী বলছি!

মৃগনয়নীর মুখখানা থমথম করে,— চুপ করে শোও ত'!

— একটু মিটুলি চচ্চড়ি খাওয়াতে পারো?

— আঃ! চুপ করো।

মৃগনয়নী ওকে জোর করে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেয়। নিজের মনে অস্ফুট আওয়াজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে বনবিহারী। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে মৃগনয়নী। উনুন ধরাতে আর ইচ্ছে নেই। রান্নার একটুও তাড়া নেই। সন্ধ্যা কখন উতরে গেছে টের পায়নি। বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। ছেলেটা বাইরে কোথায় গেল কে জানে। উঠতে আর ইচ্ছে হয় না। ঘুমন্ত বনবিহারীর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে। হাত পা সব অবশ—অসাড়। ভাবতেও পাচ্ছে না কিছু। মাথাটা যেন নীরেট হয়ে গেছে। পাথরের মত ভারি। অনেকক্ষণ—বসেই রইল। বাইরে কমলি দোরে ধাক্কা মারছে।

— অ মাসীমা। খোকাকে নাও।

এবারে উঠতে হয়। উঠে দোরটা খুলে দেয়। খোকাকে ভেতরে টেনে নেয়। হঠাৎ মনে হয়, কমলির ত' আজ রাত্রে এখানে খাবার কথা ছিল। রান্না হয়নি। মেয়েটা তবে কি খাবে? কমলিকে বলে,— দাঁড়া একটু। বনবিহারী জামার পকেটে হাত দেয়। সাঁতাই এক তাড়া নোট। এক মুঠো খুচরো। চার আনা বার করে কমলির হাতে দিয়ে বলে,—খাবার কিনে খাস। আজ আর রাঁধব না ভাবছি। তোকে ভাত আর কোত্থেকে দোব? চার আনা পেয়ে কমলি ভারি খুসি। প্রায় নাচতে নাচতে ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে যায়। দোরে খিল দিয়ে মৃগনয়নী খোকাকে বনবিহারীর পাশে শোওয়ায়। খোকা দু একবার খিদে পেয়েছে বলে। কিন্তু মৃগনয়নী আস্তে আস্তে পিঠ চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এবার নিজে ওঠে। এক গেলাস জল খায়। মাথার ভেতরটা কেমন করছে। সব যেন ঘুরছে মনে হচ্ছে। জানালার একটা পাট শক্ত করে ধরে বাইরে তাকায় মৃগনয়নী। নীরেট অন্ধকার। বর্ষার ঘোলাটে আকাশ। একটি নক্ষত্রও চোখে পড়ে না। কেননা যেন গুমোট গরমে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বুকের আঁচল নামিয়ে দেয় মৃগনয়নী। একটু হাওয়া নেই। জানালার গরাদের কাছে সরে দাঁড়ায় ও। সমস্ত ঘরটা দুর্গন্ধে ভরে গেছে। কি বিশ্রী দেখাচ্ছে বনবিহারীকে! ঘুমিয়ে পড়েছে বনবিহারী। ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে আছে। নাকটা বেঁকে আছে বালিসের চাপে। আজ ঘৃণা হচ্ছে বনবিহারীকে দেখে। চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকে মৃগনয়নী। হাতের মুঠোয় টাকা গুলো বড্ড গরম লাগছে। এতগুলো টাকা একদিনের রোজগার। ঠিক সইতে পারেনি বনবিহারী। টাকার গরমটা মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। স্নায়ুগুলোকে অস্থির করে তুলেছিল নিশ্চয়ই। তখনই হয়ত কোন এক পরম বান্ধবের সঙ্গে মদের দোকানে যেতে দ্বিধা হয়নি। মনে হয় বিভার মায়ের কথা। ধীরেনবাবু বিভাকে ঘরে ঢুকিয়ে চাবুক মারে। কেন? প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। বনবিহারী ত' তাকে অনায়াসে মারতে পারে। মদ খেলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান যে এমনভাবে লোপ পায়, ধারণাও ছিল না মৃগনয়নীর। বিভার মা ভয়ে লুকোয়। কাঁদে। মৃগনয়নী কাঁদবে না। একটুও ভয় করবে না। বনবিহারীকে নয়, তার মদকেও নয়। ভয় করলেই এরা পেয়ে বসবে। যত পালাবে, ততই বেড়ে যাবে। বিভার মায়ের আজ এই জন্যেই এমন করুণ অবস্থা। অবস্থাকে করুণ থেকে করুণতর করে তোলার জন্যে বিভার মাও অনেকটা দায়ী। মৃগনয়নী নিজেকে এত করুণ করে তোলার জন্যে বিভার মাও অনেকটা দায়ী। মৃগনয়নী এত করুণ করে তুলে করুণার ভিক্ষে

চায় না কারো কাছে। না, তার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। সে হারবে না। বনবিহারীর কাছে নয়, তার মদের কাছেও নয়। সে হারতে জানে না। জীবনে হেরে যাওয়া মানে মরে যাওয়া, বাবার কাছে বহুকাল থেকে এ কথা শিখেছে মৃগনয়নী। বিভার মা হেরে গেছে। স্বামী ফেলে বেরিয়ে আসবার মত সাহস নিয়ে যে জীবনে জিততে গিয়েছিল, সেও হেরে গেল শেষ পর্যন্ত। হারবেই ত'! অন্যা করবার দুঃসাহস মানুষকে ধীরে ধীরে ভীরু করে তোলে। এ সত্য ত অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিভার মায়ের যে সাহস ছিল, সেটা অন্যায়কে অন্তরঙ্গ করে নেবার সাহস। সেখানে শেষ পর্যন্ত বিভার মায়ের গ্লানি চোখের জলে ধুয়ে গেলেই মঙ্গল। মৃগনয়নী সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কোন অন্যায় সে করেনি যে তাকে নুয়ে চলতে হবে সংসারে। সামনে জানালা দিয়ে যে টুকরো আকাশ দেখা যাচ্ছে, সেখানে একটা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল তারার শীতল আলোয় যেন চোখ দুটো পবিত্রতায় ভরে উঠছে। মৃগনয়নীর জীবন চেতনা ওমনি একটি তারার মত দীপ্তিময়, পবিত্র। আর যাই থাক না কেন, জ্বালা নেই সেখানে।

উনিশ

একটি বছরের ওপর কেটে গেছে। চোখের পলক ফেলতেই যেন কেটে গেছে। পিছন দিকে তাকিয়ে ভাবলে মনে হয়, এই ত' সেদিনের কথা। যেন মাত্র কয়েকদিন আগেই ছোট তরফের কামরাঙাগাছ তলায় গিয়েছে দৌড়ে। জামরুল পাড়তে গিয়ে ঝগড়া হয়েছে পুঁটিদির সঙ্গে। আয়না মহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত নিষ্ফল বিকেল কেটে গেছে তরঙ্গিনীর। সাক্ষী থেকেছে মৃগনয়নী।

বেশীদিনের কথা নয়। শেষ জীবন পর্যন্ত এমনিই মনে হয়। সংসারের এক অপরূপ আশ্চর্য! মৃত্যুর আগেও মনে হয়েছে, এই ত্য সেদিন জন্মালুম। এরি ভেতর ফুরিয়ে গেল! একি কান্ড! একি বিস্ময়! এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। সূর্য উঠল আর ডুবল, ডুবল আর উঠল, আবার উঠল আর ডুবল। ব্যস্। মাত্র এই কটা ওঠা নামা দেখতেই এ জন্মের এত কান্ড! জীবনটাও মাত্র এই কটা দিনের ঘুমোন আর জাগা! হতে পারে না। জীবনের শেষ এখানেই হলে সংসারটার কোন মানে থাকত। একটা অর্থহীন প্রলাপ মনে হোত এই জীবন বন্যা। তা নয়। নিশ্চিত জেনেছে মৃগনয়নী। মৃত্যুর আগে স্পষ্টই জেনেছিল মৃগনয়নী। তা নয়। জীবনের শেষ নেই। শেষ হতে পারে না। জীবনের আদি নেই, শেষ নেই। এক একটা জন্ম এক একটা জীবন নয়। বহু বহু জন্মে মৃগনয়নী এসেছিল। আবার মৃগনয়নী আসবে। বহু বহু জন্মই হয়ত আসবে। এ জন্মে যে স্বপ্ন ভেঙে গেল তাকে সফল করে তোলবার আশা নিয়েই আসতে হবে। আশা হয়ত আশাই থেকে যাবে। আবার ভেঙে যাবে স্বপ্ন। কতকাল— কতকাল চলবে এই জন্মান্তরের ছন্দ গাঁথা।

ক্রমশঃ

বরাকরের সন্ধ্যা

বুদ্ধদেব ঘটক

এইতো নিভলো রোদ। কী যে করি
ছায়াপাহাড়ের গায়ে নীলাকাশ;
এখুনি এ-আলো মুছ্‌লো কে যাদুকরী!

মাঠের বেগুনী রঙে ধূসর আভাস।
ভালোত লাগেনা মনে কিছু;
কতদিন ছুট্‌লুম মায়া-হরিণীর পিছুপিছু।

আকাশে ত রোজ ফোটে এক সন্ধ্যাতারা
একান্ত নির্জনে দেখি তাকে —
কবে বলো শেষ হবে আমার পাহারা

কবে আমি পোড়াবো এ সুপ্ত বেদনাকে?
হায়, এ বেদনা নিয়ে কী যে করি
সন্ধ্যা খোলে শ্লথ হাতে চুলের কবরী!

একটি চিন্তা

সন্তোষ চক্রবর্তী

একটি অলস দুপুর কিংবা বিকেল বেছে নিয়ে
স্বপ্নে-সুরে-রঞ্জনে সে-হৃদয় ভরে দিয়ে
অনেক শান্তি। দুই চোখে তার অনেক উদাসীন
উজ্জ্বলতা উপচে পড়ে : সোনার মত দিন!
আমার নামে শুধু আমার নামে
প্রহর যাপে : একটি দুটি বেদনা এসে থামে
হয়তো-বা সে নীড়ে —
ধানসোনা গ্রাম, নীলা নদীর তীরে।

তাহার আঁখিমায়ার অনাবিল
পরশ পেয়ে ধন্য হলো আকাশ — হলো নীল :
আমার নাম স্মরণে এনে সে যদি জ্বালে আলো
— ভাবতে কী-যে ভালো ॥

আ লো চ না

ছোট গল্পের সংকট

অধুনা বাঙলা সাহিত্যে রসোত্তীর্ণ সার্থক ছোট গল্প লিখিত হচ্ছে না বলে যে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে, সে সম্পর্কে চিন্তা করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগবে, তবে কি বাঙলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্প লেখক নেই? নাকি বিষয়বস্তুর অভাব?

বাঙলা সাহিত্যে ছোটগল্প নবাগত। কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যেই স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এমন কথাও একাধিক বিদগ্ধ সমালোচক বলেছেন যে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের পাশাপাশি ঠাঁই পাবার মত ছোটগল্প বাঙলা ভাষায় লিখিত হয়েছে। তবে আজ এই দৈন্য কেন? আত্মপ্রসাদের মোহে কি আমরা আত্মসমাধিক্ষেত্র খনন করছি?

বাঙলা সাহিত্যে ছোটগল্পের জন্মলগ্ন থেকে তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যাক। কিছুকাল পূর্বেও উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত বা বড়গল্পের সিনপসিসকেই ছোট গল্প হিসেবে দেখা হত। বাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয় এই অর্থে ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথের পূর্বযুগ পর্যন্ত বাঙলা ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না।

আমাদের যুগ ও জীবন পরিবর্তিত হচ্ছে, জীবনে অজস্র সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। যন্ত্র-সভ্যতার পত্তন হল নতুন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি হল, শহর তৈরী হল, বৃহৎ শিল্পকারখানা গড়ে উঠল—চাঞ্চল্য জাগল ধীরমন্থর জীবনে। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে এলো অজস্র নতুন সমস্যা। পুরোনো রীতিনীতি পাল্টে গেল—জীবনে দেখা দিল কতকগুলো আশ্চর্য জিজ্ঞাসা। এই যন্ত্রণা, ক্ষোভ, অতৃপ্তি, জিজ্ঞাসা, ও দীর্ঘশ্বাসের মাঝে ছোট গল্পের জন্ম। হতাশা, অনিশ্চয়তার যুগেই সার্থক ছোটগল্প সৃষ্টির সম্ভাবনা। দুর্ভিক্ষের বাঙলা— সেই তেরোশ পঞ্চাশের ছোট গল্পে যে শ্রেষ্ঠত্ব তার তুলনা বিরল। এখন সেই দীপ্তি ম্লান হয়ে গিয়েছে। তখন দুর্নীতি, হাহাকার, কান্নায় সফল সৃষ্টি হয়েছিল। শেকভ-মোঁপাসার যুগের ছবিও অনুরূপ। ভাঙন ও অতৃপ্তির যুগেই সার্থক ছোট গল্প লেখকরা জন্মেছেন।

চতুর্দিকে পরিবর্তনের ঢেউ। নতুন শহর কলকাতার গঠন পর্ব চলছে। এদিকে কলকারখানা তৈরী চলছে,— কোম্পানীর জমিদারী, ওদিকে নয়া বন্দর সৃষ্টি — একটা নতুন সভ্যতার হাওয়া। অন্যদিকে পুতুলনাচ, হাফ-আখড়াই, তথাকথিত বাবুদের বিলাসব্যসন, উচ্ছৃংখল মত্ততা চলছে পূর্ণোদ্যমে। বাঙ্গালীর ব্যবসায় বিদেশীর হাতে চলে যাচ্ছে। এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সময় প্রথম বাঙলা ছোট গল্পের আবির্ভাব।

বাঙ্গালী বড়লোকরা চাকরী নিতে সুরু করেছেন। দেওয়ানী থেকে সওদাগরী। যুগ পরিবর্তিত হচ্ছে। এই যুগসন্ধিক্ষণে ছোট গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন রবীন্দ্রনাথ। দেশে অরাজকতা— স্বাধীনতা চাইছে দেশ—গণ-আন্দোলন, বিক্ষোভ চতুর্দিকে। রবীন্দ্রনাথ ক্লান্ত হলেন। রাজনীতির জটিল আবর্ত থেকে মুক্ত হতে চাইলেন। নগর থেকে গ্রামের জীবন দেখলেন— নতুন অভিজ্ঞতা হল। সাধারণ মানুষকে দেখলেন! সৃষ্টি হল ছোট গল্পের।

ঊনিশশো পাঁচের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশকে নতুন করে জানবার আগ্রহ হল। সাহিত্যিকরা সচেতন হলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সরোজনাথ ঘোষ, প্রমথ চৌধুরী ছোট গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন।

ছোটগল্প লেখককে তত্ত্বপ্রচার করতে হয় না, জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করতে হয়। বাঙলা-সাহিত্যে এখনো সার্থক ছোটগল্প লিখিত হতে পারে। অন্ততঃ যুগপরিবেশ ছোটগল্প লিখিত হবার স্বপক্ষে। বর্তমানে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আজ অস্থিরতা চাঞ্চল্য, অনিশ্চয়তা। একে ছোটগল্প লেখার সুবর্ণ-মুহূর্ত বলা চলে। কিন্তু কোন সাহিত্যিককে এই সময়ের সদ্ব্যবহার করতে দেখছি না। আমার বিশ্বাস প্রতিভাবান স্রষ্টাও আছেন। তাই মনে প্রশ্ন জাগে, সার্থক রসোত্তীর্ণ ছোট গল্প পাচ্ছিনা কেন! তবে কি ভাবতে হবে, ছোট গল্প লিখবার প্রতিভা যাঁর, তিনি স্বপথচ্যুত হয়ে উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করছেন? সাধারণ জনপ্রিয়তাই কি সাহিত্যিকে পথভ্রষ্ট করছে? নাকি, ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি তাদের সাধনাকে ব্যাহত করছে? অজস্র সাময়িক পত্রিকার পাতায় নিয়ত রাশিরাশি ছোটগল্পের আত্মপ্রকাশ হচ্ছে — তবুও আশান্বিত হতে পারছি না। মন যা চায় তা পায় না। প্রকাশক ও পাঠকের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিজের আত্মার তৃপ্তিসাধনে যে সাহিত্যিক দৃঢ়ভাবে কলম ধরবেন তাঁর দ্বারাই রসোত্তীর্ণ সার্থক ছোটগল্প, এই যুগেও পুনরায় লিখিত হতে পারবে। নইলে অন্তরে গভীর হতাশা বহন করা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই।

হরেন ঘোষ

সাধারণ রঙ্গালয়

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ বাঙলার নাট্যশালা এবং নাটকের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। নাটকের অভিনয়কে ধনীসমাজের কুক্ষি হইতে মুক্ত করিয়া সর্বসাধারণের উপভোগের পথ সুগম করিয়া তুলিবার জন্য জনমত গড়িয়া উঠিতেছিল। সমসাময়িক সংবাদপত্রে ইহা প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। ইহার ফলে বাগবাজারের কয়েকজন যুবক লীলাবতী নাটকের অভিনয়ে সাফল্য লাভ করিয়া সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াস আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রথম হইতেই ইহাতে মতান্তর ও দলাদলি দেখা যায়। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণের জন্য অনেকে এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তথাপি ন্যাশনাল থিয়েটার অভিনয় আরম্ভ করেন। দীনবন্ধুর এবং রামনারায়ণের নাটকগুলি, শিশির কুমার ঘোষের নয়শো রুপেয়া (১২৯৭) কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত মাতা এখানে অভিনীত হইতে থাকে।

কিন্তু আবার দলাদলি দেখা যায়। ১৭।১৮টি অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটার ভাঙিয়া যায় এবং একদল হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করিয়া ১৮৭৩ র ৫ই এপ্রিল হইতে অভিনয় আরম্ভ করেন। তখন গিরিশচন্দ্র অপর দলকে লইয়া ন্যাশনাল থিয়েটার নামে ঐ বৎসরের ২৯শে মার্চ নীলদর্পন নাটকের অভিনয় করেন।

এই সময় হইতে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ১৮৭৩-তেই ওরিয়েন্টাল থিয়েটার রামনারায়ণের মালতীমাধব অভিনয় লইয়া আত্মপ্রকাশ করে এবং ঐ বৎসরেই ইহার জীবন শেষ হইয়া যায়।

ঐ বৎসরই বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নানাকারণে এই প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য। এইখানে সর্বপ্রথম স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু অনেকেই ইহা অনুমোদন করেন নাই। সমসাময়িক পত্রিকায় ইহার প্রতিবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল।

বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেলের শর্মিষ্ঠা-ই সর্বপ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহার মায়াকানন অভিনীত হয়। ইহাছাড়া, রামনারায়ণের স্বপ্নধন, বিদ্যাসুন্দর, যেমন কর্ম তেমনি ফল, দুর্গেশ নন্দিনীর নাট্যরূপ, মোহান্তের এই কি কাজ, প্রভৃতি নাটক অভিনীত হইয়াছিল।

১৮৭৩ সনের শেষের দিকে হিন্দু ন্যাশনাল দল গ্রেট ন্যাশনাল নাম ধারণ করিয়া পূর্ণ উদ্যমে অভিনয় আরম্ভ করে। তাহাদের নিজস্ব বাড়িতে কাম্য কাননের অভিনয় প্রথম রাত্রিতেই আগুন লাগিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ১৮৭৪ সনের জানুয়ারী হইতেই নিজ রঙ্গমঞ্চে বিধবা-বিবাহ নাটক অভিনীত হয়। তারপর একাদিক্রমে মনোমোহন বসুর প্রণয় পরীক্ষা, মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষের নাট্যরূপ, কুলীনকন্যা বা কমলিনী প্রভৃতির অভিনয় হইতে থাকে। ১৮৭৫এ গ্রেট ন্যাশনাল বাঙলার বাইরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ এবং অভিনয় করিয়া বাঙলা নাটকের জনপ্রিয়তা বাড়াইয়া দিয়াছিল।

প্রথমদিকে স্ত্রী-চরিত্রগুলি পুরুষেরা অভিনয় করিলেও পরে স্ত্রীলোকেরাই করিতে থাকেন।

১৮৭৫এ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ও নিউ এরিয়ান (লেট ন্যাশনাল) থিয়েটার স্থাপিত হয় এবং সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকের অভিনয় হয়।

১৮৮৪ এ স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এবং অমৃতলাল বসু যোগ দেন এবং গিরিশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ নাটকের অভিনয় করেন।

১৮৯৬-এ অমরনাথ দত্ত ক্লাসিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে গিরিশচন্দ্রের হারানিধি ও ক্ষীরোদ প্রসাদের আলিবাবা অভিনীত হয়। অমরনাথের চেষ্টায় নাটক ও নাট্যশালা সম্বন্ধে সাপ্তাহিক রঙ্গালয় ও মাসিক নাট্যমন্দির পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

সে যুগে এতগুলি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা এবং অভিনয়ে উৎসাহী ব্যবসমাবেশের ফলে অভিনয়ের উপযোগী নাটক রচনার প্রয়োজন স্বভাবতঃই বাড়িয়া যায়। ফলে অনেকগুলি নাটক রচিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকটি অভিনয়ে সফলতাও লাভ করে।

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতীয়তা বোধক ভারত মাতা (১৮৭৩)-র পর ভারতে যবন (১৮৭৪), হারাণচন্দ্র ঘোষের ভারত দুঃখিনী (১২৮২), নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কি সেই ভারত (১২৮২), কুঞ্জবিহারী বসুর ভারতে অধীন? (১২৮১), ধর্মক্ষেত্র (১২৮৩), হরলাল রায়ের হেমলতা (১৮৭৩) উল্লেখযোগ্য।

হরলাল আরও কয়েকটি নাটক রচনা করেন। বেনীসংহারের অনুভব শত্রু সংহার (১৮৭৪), মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় অবলম্বনে বঙ্গের সুখাবসান (১৮৭৪), ম্যাকবেথ অবলম্বনে রুদ্রপাল (১৮৭৪) এবং শকুন্তলা অবলম্বনে কনকপদ্ম (১৮৭৫) নাটকগুলি অভিনীত হইয়াছিল।

মদনমোহন মিত্র কয়েকটি নাটক রচনা করেন — মনোরমা নাটক (১৮৭২) মদ্যপান ও ব্যাভিচারের ফলে পারিবারিক বিপর্যায়ের করুণ বাস্তব চিত্র। বৃহন্নলা একটি পৌরাণিক নাটক (১৮৭৪)। শরদ প্রতিমা (১৮৭৮) নামে দেবীমাহাত্ম্য প্রচারক নাটক।

ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া কয়েকটি নাটক রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এগুলিকে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না, কারণ ইহাদের কাহিনীর সহিত ইতিহাসের যোগসূত্র অতিশয় ক্ষীণ। লক্ষ্মনারায়ণ চক্রবর্তী এইরূপ নাটক রচনা করেন। নন্দবংশোচ্ছেদ (১৮৭৩) ও নবাব সেরাজদ্দৌলা (১৮৭৬) এই জাতীয় নাটক। ইহা ছাড়া, লক্ষীনারায়ণ কুলীন কন্যা বা কমলিনী (১৮৭৪) ও আনন্দকানন (১৮৭৪) নামে দুইটি নাটক রচনা করেন।

এই সকল নাটক এবং জনপ্রিয় উপন্যাস ও কাব্যের নাট্যরূপ অভিনয় করিয়াও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে মিটে নাই। নূতন নাটকের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে এবং নূতন নাটক ও নাট্যকারের সন্ধানে অভিনয়ের উদ্যোক্তারা ঘুরিতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্যই বাঙলা নাটক রচনার সূত্রপাত হয় এবং নাট্যকাররূপে আমরা পাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স মা লো চ না

বিদেশ বিভুঁই ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা। দাম—ছ-টাকা।

সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'বিদেশ বিভুঁই' বহু পরিমার্জন ও পরিবর্তনের পর সম্প্রতি তিনশ পৃষ্ঠার একখানা সচিত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছে। 'বিদেশ বিভুঁই' নিছক একখানা ভ্রমণ-কাহিনী নয়। ভ্রমণ বিবরণ ছাড়াও গ্রন্থখানাতে ইতিহাস ভূগোল-এর বহু তথ্য সরস লেখনীতে পরিবেশিত। ভ্রমণ মানে গতি। আমেরিকান সমাজ জীবনে আছে দ্রুততা ও অফুরান কর্মচঞ্চলতা। সদা ধাবমান দ্রুত চঞ্চল আমেরিকানদের মতোই লেখকের এই ভ্রমণ কাহিনীতে ভাষার দুরন্ত গতিবেগ পাঠক-চিত্তকে মুগ্ধ করে।

অতলান্তিক মহাসমুদ্র পারাপার সচরাচর সকলের ভাগ্যে ঘটে না—ঘটার কথাও নয়। লেখক যখন শূন্যপথে এই বিরাট জলধি (সাড়ে তিন হাজার মাইল) পার হচ্ছিলেন তখন তাঁর স্মৃতিতে জাগে অতীতে জলধি বিমানে লিন্ডবার্গের অতলান্তিক অতিক্রমণের রোমাঞ্চকর যাত্রা-কথা (৬০ পৃঃ)। সে কাহিনী পড়তে পড়তে প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেমন ভাষা তেমনি বর্ণনা কৌশল। আরেকটি যেমন ঃ রাজধানী ওয়াশিংটন শহর পত্তনের ইতিহাস (৮৭ পৃঃ)। একটি রোমান্টিক গল্পের মতন শহর পত্তনের ইতিকথা লেখক বলে গেছেন ঝরঝরে ভাষা, বর্ণনার রঙিন বুনানিতে। এরকম আরো অনেক গল্পের অবতারণা করেছেন লেখক। যেমন ঃ ওয়াশিংটন-এর সমাধি-ভবন (১৪৫ পৃঃ), জেনারেল লাফায়েৎ (১৪৩ পৃঃ) ও অন্যান্য। বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে এই ধরণের এক একটি গল্প ও সত্যি কাহিনী থাকায় পাঠকের উপভোগের ক্ষেত্রে বইটি হয়েছে বিশেষ মনোময় ও জমাটি।

আমাদের ভারত-ভূমি অনেক কালের প্রাচীন দেশ, কিন্তু এই সেদিনের আমেরিকা যা কলম্বাস আবিষ্কার করলেন সে আমেরিকা দেখতে দেখতে মাত্র সাড়ে তিনশ বছরের ভেতর কী জাদুর স্পর্শে বিশ্ববাসীর চোখে অবাক বিস্ময়ের কাজল পরাল সে রহস্য জানার কৌতূহল পাঠকের জাগা স্বাভাবিক। জিজ্ঞাসু পাঠকের সে কৌতূহল দক্ষিণারঞ্জন জিইয়ে রাখেন নি, নিবৃত্ত করেছেন ঃ 'ভারত ও আমেরিকার জীবনাদর্শ', 'আমার ভারত, ওদের আমেরিকা' প্রভৃতি পরিচ্ছেদগুলোতে। এই পরিচ্ছেদগুলো পড়ে শেষ করার পর পাঠকের মনে নিশ্চয়ই এ ভাবনা জাগবে মার্কিনীদের কাছে যেমন আমাদের শেখার অনেক কিছু উপাদান আছে তেমনি ওদেরও আমাদের কাছে নেবারও যে অনেক কিছু রয়েছে। পাঠকের ভাবনা লেখক রাখেন নি, তিনি নিজেই এর সমাধান করেছেন 'মার্কিন রাষ্ট্রের ভারত-চিন্তা', 'বাঙলার পরিবেশ' ইত্যাদি অধ্যায়ে। এ অধ্যায়গুলো পড়ার পর স্বভাবতই পাঠকচিত্তে মার্কিন সমাজ জীবনের ইতিবৃত্ত জানার সাধ জাগে। সে সাধ মেটে 'শনি-রবিবারের ওয়াশিংটন,' 'শহরতলীর আমন্ত্রণ', 'গ্রীষ্মের শেষ উৎসব' 'আমেরিকার শ্রমিক জীবন' 'সংখ্যাতত্ত্বের দেশ' আর 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা' অধ্যায়গুলোতে। দক্ষিণারঞ্জন সাংবাদিক। সাংবাদিকের যে সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকা একান্ত প্রয়োজন তা তাঁর পূর্ণ মাত্রায় আছে। তাঁর নজর থেকে কোনো কিছু এড়িয়ে যায় না—সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে

সব কিছুকে তিনি দেখেন, তুলনা ও যাচাই করেন। ঘর ছেড়ে বের হবার পর থেকেই আমরা তাঁর সে সদাজাগ্রত দৃষ্টির পরিচয় পাই ঃ করাচীর ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোনোর সময়, 'এশিয়া ছেড়ে ইয়োরোপ' অধ্যায়ে বেরুটের সাগরবেলার প্রকৃতি বর্ণনায়, ট্রাফালগার স্কোয়ারকে লাল-পাঁজি সঙ্গে, লাফায়েত স্কোয়ারের সঙ্গে ইডেন উদ্যানের তুলনায়, লণ্ডন-এর বিমান-বন্দর থেকে হোটেল পর্যন্ত লম্বা পথ পাড়িতে (৪৪ পৃঃ)। বিশেষ করে তাঁর এ গুণের দৃষ্টান্ত সুস্পষ্ট রূপে পাওয়া যায় 'রাজধানীর পথের পাঁচালী' অধ্যায়ে।

ভৌগোলিক ব্যবধান বিভিন্ন দেশের আচার আচরণের মধ্যে পার্থক্য ঘটালেও নিখিল বিশ্বের সমস্ত জনগণেশের মন বস্তুটি এক। নানা অমিল সত্ত্বেও মানুষে মানুষে মিল অনেক। সংস্কৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে ভারত ও আমেরিকার সাংস্কৃতিক পার্থক্য যে নেই তা যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন লেখক 'অনেক দেশ, এক পৃথিবী' অধ্যায়ে।

'বিদেশ বিভুই'-এ আমেরিকায় শাদা-কালো বর্ণবৈষম্যের বিস্তারিত আলোচনার অবসংশয়িত জিজ্ঞাসু মনের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে সমর্থ হয় নি। এর কারণ হয়তো লেখক সমগ্র আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এই বইএ লিপিবদ্ধ করেন নি। ভারত ছেড়ে আমেরিকা যাত্রার পথে তিনি যে সমস্ত দেশ অল্প সময়ের জন্যে দেখেছিলেন তার কিছু কিছু বিবরণ ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে যে পক্ষকাল তিনি অবস্থান করেছিলেন কেবল সে অভিজ্ঞতার লিপিবদ্ধ আছে 'বিদেশ বিভুই'-এ। আলোচ্য গ্রন্থের 'অনেক দেশ, এক পৃথিবী' অধ্যায়ে শ্রীবসু নিউ বিশ্ববিদ্যালয় হাওয়ার্ড পরিদর্শন ও ওয়েলিংটন থেকে ট্রেনে নিউ ইয়র্ক যাবার পথে নিগ্রো সমস্যার যে খণ্ডচিত্র পরিবেশন করেছেন তা যেমন জীবন্ত তেমনই চাঞ্চল্যকর।

পরিশেষে বলা যায়—'বিদেশ বিভুই' বাঙলা ভ্রমণ-সাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন॥

রাণা বসু

আজকের পশ্চিম ॥ ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৩ মহাত্মা গান্ধি রোড্ কলিকাতা—৭। মূল্য ৪·৫০।

দীর্ঘকালের কংগ্রেস নেতা এবং একটি রাজ্যের স্বল্পকালীন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেশ ও দেশের মানুষকে ভালভাবে চিনিবার ও জানিবার বহু সুযোগ ডাঃ ঘোষ পাইয়াছেন। সৎ ও কৃত জনসেবক হিসাবে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার বহু দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে তাঁহার সচেতনতা তাঁহাকে পশ্চিম যাত্রার প্রেরণা দেয়। ডাঃ ঘোষের ভাষায় "পশ্চিম যাত্রার পরিকল্পনা করি পশ্চিমের বাস্তব উন্নতির মূলে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে যাতে দেশে ফিরে ভারতের উন্নতিকল্পে ব্যবস্থানুযায়ী সংশোধন করে তা কাজে লাগাতে পারি। জাতির আরো যোগ্য সেবক হওয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য।" উপরোক্ত উদ্দেশ্য লইয়া ডাঃ ঘোষ ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড পরিদর্শন করেন। এই সব দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা, কৃষি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার অতি মনোজ্ঞ, ও তথ্যপূর্ণ বিবরণে আলোচ্য পুস্তকটি সমৃদ্ধ, অন্য যে সব আলোচনা আছে তাহাও বিশেষ উপভোগ্য। যুদ্ধ বিধ্বস্ত পশ্চিম জার্মানীর সামগ্রিক উন্নয়নের ও শরণার্থী সমস্যা সমাধানের কাহিনী

পাঠকের বিস্ময় উৎপন্ন করিবে। যুক্তরাষ্ট্রে ডাঃ ঘোষের সহিত মহামনীষী আইনষ্টাইনের স্বল্পকালীন সাক্ষাৎকারের বর্ণনাটি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

বহির্বিশ্বে ভারতবর্ষের সম্মান সম্বন্ধে আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতার জন্য, এবং আধুনিক কালে রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, সি, ভি রামন, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধির জন্মভূমি হিসাবে জগতের শিক্ষিত সমাজ অবশ্যই ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করে—কিন্তু বর্তমান ভারতের প্রতি এই শ্রদ্ধার পরিচয় পাশ্চাত্য জনগণের নিকট হইতে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে ডাঃ ঘোষের এই মন্তব্যটি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন প্রত্যেক ভারতবাসির হৃদয়ে জাগরূক থাকা উচিত। 'লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত মানুষ, পথে পথে ভিক্ষুকের ভিড়, শাসন ব্যবস্থায় অসততা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, শিক্ষার নিম্নহার এই সব কারণে পশ্চিমের দৃষ্টিতে ভারতের মর্যাদা খুবই কম।"

দেশকে যাঁহারা ভালবাসেন, দেশের যাঁহারা উন্নতি চান তাঁহাদের প্রত্যেকের পক্ষেই এই বইখানি পাঠ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়নের দায়িত্ব যাঁহাদের আছে তাঁহাদের হাতে এই বইখানি পৌঁছান প্রয়োজন। ডাঃ ঘোষ তাঁহার অর্জিত অভিজ্ঞতা কি ভাবে কাজে লাগান এই পুস্তকের পাঠক মাত্রই তাহার প্রতীক্ষা করিবে। সরকারী ক্ষমতা হাতে না থাকিলেও যে কাজ করা যায় শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত, ডাঃ ঘোষ ও তাঁহার অভয় আশ্রমের সহকর্মিরা অতীতে ইহার প্রমাণ দিয়াছেন।

বইখানি ডাঃ ঘোষের পূর্ব প্রকাশিত "ওয়েস্ট টু-ডে" গ্রন্থের অনুবাদ, অনুবাদিকা—শ্রীমতী সাধনা সোম। অনুবাদ স্বচ্ছ ও সাবলীল অনুবাদের স্বাভাবিক জড়তা বইখানিতে অনুপস্থিত।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

সামনে চড়াই ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র। গ্রন্থম, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। দাম দেড় টাকা।

আঠারো সর্গের মহাকাব্য পড়বার সময় আর আমাদের নেই। জীবনের বৃত্ত প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। নানা কাজের ঘূর্ণিপাকে উদ্দাম হয়ে মানুষ ঘুরছে। আগেকার মতো পড়ে-যাওয়া অবকাশ আর নেই। এখন ঐ ঘূর্ণী থেকে কোনমতে দুচার মিনিট বাঁচিয়ে, মনটাকে জল দিয়ে, সার দিয়ে টবে পোঁতা ফুল গাছের মত কোন মতে জীইয়ে রাখার চেষ্টা। আঠারো সর্গের মহাভারত আঠারো পাতায় এসে দাঁড়িয়েছে, কোথাও আঠারো লাইনেই কাব্যের দৃঢ়পিনদ্ধ আধুনিকতা ফুটে উঠছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিম আনলেন রোমান্স আর সামাজিক উপন্যাস। মধ্যযুগীয় ভারতের রাজকাহিনী জুড়ে বসলো কৌতূহলী মনকে। সেই ধারার অনুসরণ বেশ কিছুকাল চললো। তার পর কাহিনীর আরও সংক্ষিপ্তরূপায়ণের দাবী স্পষ্ট হতে না হতেই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের স্রোত বাংলা সাহিত্যের খাতে প্রবল বেগে বইতে লাগলো। অন্যান্য সাহিত্য রীতির অগ্রগতির সঙ্গে ছোটগল্পও নানা নতুন রূপে এগুতে লাগলো এবং বয়সে সর্ব কনিষ্ঠ হলেও সেরা সাহিত্যিকদের আর পাঠকদের নজর তার ওপরই পড়ল বেশী।

সব কিছুকে তিনি দেখেন, তুলনা ও যাচাই করেন। ঘর ছেড়ে বের হবার পর থেকেই আমরা তাঁর সে সদাজাগ্রত দৃষ্টির পরিচয় পাই ঃ করাচীর ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোনোর সময়, 'এশিয়া ছেড়ে ইয়োরোপ' অধ্যায়ে বেরুটের সাগরবেলার প্রকৃতি বর্ণনায়, ট্রাফালগার স্কোয়ারকে লাল-দীঘির সঙ্গে, লাফায়েত স্কোয়ারের সঙ্গে ইডেন উদ্যানের তুলনায়, লন্ডন-এর বিমান-বন্দর থেকে হোটেল পর্যন্ত লম্বা পথ পাড়িতে (৪৪ পৃঃ)। বিশেষ করে তাঁর এ গুণের দৃষ্টান্ত সুস্পষ্ট রূপে পাওয়া যায় 'রাজধানীর পথের পাঁচালী' অধ্যায়ে।

ভৌগোলিক ব্যবধান বিভিন্ন দেশের আচার আচরণের মধ্যে পার্থক্য ঘটালেও নিখিল বিশ্বের সমস্ত জনগণেশের মন বস্তুটি এক। নানা অমিল সত্ত্বেও মানুষে মানুষে মিল অনেক। সংস্কৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে ভারত ও আমেরিকার সাংস্কৃতিক পার্থক্য যে নেই তা যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন লেখক 'অনেক দেশ, এক পৃথিবী' অধ্যায়ে।

'বিদেশ বিভুঁই'-এ আমেরিকায় শাদা-কালো বর্ণবৈষম্যের বিস্তারিত আলোচনার অভাব সংশয়িত জিজ্ঞাসু মনের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে সমর্থ হয় নি। এর কারণ হয়তো লেখক সমগ্র আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এই বই-এ লিপিবন্ধ করেন নি। ভারত ছেড়ে আমেরিকা যাত্রার পথে তিনি যে সমস্ত দেশ অল্প সময়ের জন্যে দেখেছিলেন তার কিছু কিছু বিবরণ ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে যে পক্ষকাল তিনি অবস্থান করেছিলেন কেবল সে অভিজ্ঞতার লিপিলেখ আছে 'বিদেশ বিভুঁই'-এ। আলোচ্য গ্রন্থের 'অনেক দেশ, এক পৃথিবী' অধ্যায়ে শ্রীবসু নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয় হাওয়ার্ড পরিদর্শন ও ওয়েলিংটন থেকে ট্রেনে নিউ ইয়র্ক যাবার পথে নিগ্রো সমস্যার যে খণ্ডচিত্র পরিবেশন করেছেন তা যেমন জীবন্ত তেমনই চাঞ্চল্যকর।

পরিশেষে বলা যায়—'বিদেশ বিভুঁই' বাঙলা ভ্রমণ-সাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন ॥

রাণা বসু

আজকের পশ্চিম ॥ ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ৯৩ মহাত্মা গান্ধি রোড্ কলিকাতা—৭। মূল্য ৪·৫০।

দীর্ঘকালের কংগ্রেস নেতা এবং একটি রাজ্যের স্বল্পকালীন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেশ ও দেশের মানুষকে ভালভাবে চিনিবার ও জানিবার বহু সুযোগ ডাঃ ঘোষ পাইয়াছেন। সৎ ও কৃত জনসেবক হিসাবে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার বহু দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে তাঁহার সচেতনতা তাঁহাকে পশ্চিম যাত্রার প্রেরণা দেয়। ডাঃ ঘোষের ভাষায় "পশ্চিম যাত্রার পরিকল্পনা করি পশ্চিমের বাস্তব উন্নতির মূলে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে যাতে দেশে ফিরে ভারতের উন্নতিকল্পে ব্যবস্থানুযায়ী সংশোধন করে তা কাজে লাগাতে পারি। জাতির আরো যোগ্য সেবক হওয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য।" উপরোক্ত উদ্দেশ্য লইয়া ডাঃ ঘোষ ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, হল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড পরিদর্শন করেন। এই সব দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা, কৃষি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার অতি মনোজ্ঞ, ও তথ্যপ্রদ বিবরণে আলোচ্য পুস্তকটি সমৃদ্ধ, অন্য যে সব আলোচনা আছে তাহাও বিশেষ উপভোগ্য। যুদ্ধ বিধ্বস্ত পশ্চিম জার্মানীর সামগ্রিক উন্নয়নের ও শরণার্থী সমস্যা সমাধানের কাহিনী

পাঠকের বিস্ময় উৎপন্ন করিবে। যুক্তরাষ্ট্রে ডাঃ ঘোষের সহিত মহামনীষী আইনষ্টাইনের স্বল্পকালীন সাক্ষাৎকারের বর্ণনাটি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

বহির্বিশ্বে ভারতবর্ষের সম্মান সম্বন্ধে আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতার জন্য, এবং আধুনিক কালে রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, সি, ভি রামন, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধির জন্মভূমি হিসাবে জগতের শিক্ষিত সমাজ অবশ্যই ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করে—কিন্তু বর্তমান ভারতের প্রতি এই শ্রদ্ধার পরিচয় পাশ্চাত্য জনগণের নিকট হইতে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে ডাঃ ঘোষের এই মন্তব্যটি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন প্রত্যেক ভারতবাসির হৃদয়ে জাগরুক থাকা উচিত। "লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত মানুষ, পথে পথে ভিক্ষুকের ভিড়, শাসন ব্যবস্থায় অসততা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, শিক্ষার নিম্নহার এই সব কারণে পশ্চিমের দৃষ্টিতে ভারতের মর্যাদা খুবই কম।"

দেশকে যাঁহারা ভালবাসেন, দেশের যাঁহারা উন্নতি চান তাঁহাদের প্রত্যেকের পক্ষেই এই বইখানি পাঠ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়নের দায়িত্ব যাঁহাদের আছে তাঁহাদের হাতে এই বইখানি পৌঁছান প্রয়োজন। ডাঃ ঘোষ তাঁহার অর্জিত অভিজ্ঞতা কি ভাবে কাজে লাগান এই পুস্তকের পাঠক মাত্রই তাহার প্রতীক্ষা করিবে। সরকারী ক্ষমতা হাতে না থাকিলেও যে কাজ করা যায় শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত, ডাঃ ঘোষ ও তাঁহার অভয় আশ্রমের সহকর্মিরা অতীতে ইহার প্রমাণ দিয়াছেন।

বইখানি ডাঃ ঘোষের পূর্ব প্রকাশিত "ওয়েস্ট টু-ডে" গ্রন্থের অনুবাদ, অনুবাদিকা—শ্রীমতী সাধনা সোম। অনুবাদ স্বচ্ছ ও সাবলীল অনুবাদের স্বাভাবিক জড়তা বইখানিতে অনুপস্থিত।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

সামনে চড়াই ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র। গ্রন্থম, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। দাম দেড় টাকা।

আঠারো সর্গের মহাকাব্য পড়বার সময় আর আমাদের নেই। জীবনের বৃত্ত প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। নানা কাজের ঘূর্ণিপাকে উদ্দাম হয়ে মানুষ ঘুরছে। আগেকার মতো পড়ে-যাওয়া অবকাশ আর নেই। এখন ঐ ঘূর্ণী থেকে কোনমতে দুচার মিনিট বাঁচিয়ে, মনটাকে জল দিয়ে, সার দিয়ে টবে পোঁতা ফুল গাছের মত কোন মতে জীইয়ে রাখার চেষ্টা। আঠারো সর্গের মহাভারত আঠারো পাতায় এসে দাঁড়িয়েছে, কোথাও আঠারো লাইনেই কাব্যের দৃঢ়পিনদ্ধ আধুনিকতা ফুটে উঠছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিম আনলেন রোমান্স আর সামাজিক উপন্যাস। মধ্যযুগীয় ভারতের রাজকাহিনী জুড়ে বসলো কৌতূহলী মনকে। সেই ধারার অনুসরণ বেশ কিছুকাল চললো। তার পর কাহিনীর আরও সংক্ষিপ্তরূপায়ণের দাবী স্পষ্ট হতে না হতেই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের স্রোত বাংলা সাহিত্যের খাতে প্রবল বেগে বইতে লাগলো। অন্যান্য সাহিত্য রীতির অগ্রগতির সঙ্গে ছোটগল্পও নানা নতুন রূপে এগুতে লাগলো এবং বয়সে সর্ব কনিষ্ঠ হলেও সেরা সাহিত্যিকদের আর পাঠকদের নজর তার ওপরই পড়ল বেশী।

মাসিক পত্রের কল্যাণে ছোটগল্পের চাহিদা যেমন বাড়লো তেমনি তার রূপ আর বিষয়-বস্তুর প্রতিদিন বদল হতে লাগলো জনসাধারণের ক্ষণিকের খেয়াল খুশী আর ফ্যাসনের দাবীতে। দুদিন আগেকার গল্প, আজ সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। পাঠকের মনে আজ রাজত্ব করে 'বালিগঞ্জের টিপার্টি',' কাল রাজত্ব করছে 'মজুরের লাল ঝান্ডা' তারপর দিন 'সংকীর্ণ একতলা বাড়ির দশঘর ভাড়াটে'—সঙ্গে সঙ্গে মাসিকপত্রের ছোট গল্পেরও জাত বদলাচ্ছে। এই ডামাডোলের মধ্যে অনেক ভাল শিল্পী ভেসে যাচ্ছেন। আজকের হাততালি যে রাত পার হয়ে কাল সকালে আর বাজবে না, আজকের খুসীতে সে কথা আর মনে থাকছে না।

এই স্রোতেভাসার দিনে যে কজন সাহিত্যিকের ছোট গল্প একদিনেই ফুরিয়ে যাচ্ছে না, যাঁদের গল্প পাঠকের খেয়াল খুসীর মুখ চেয়ে নয় তাঁদেরই একজন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর কয়েকটি গল্প একসঙ্গে বেরিয়েছে—'সামনে চড়াই।' আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের ঘটনাই প্রায় সব, তবে ঠিক যা ঘটে তা নয়। 'বাস্তবসাহিত্য সৃষ্টির ধোঁয়াটে শ্লোগানে গল্পগুলি অকারণ কাঠিন্য লাভ করেনি। কল্পনার বিদ্যুৎ স্পর্শে অতি সাধারণ ভুল, ত্রুটি, অতি সাধারণ সব চরিত্র অসাধারণ হয়ে উঠছে। কোন গল্পই শুধু কাহিনী নয়, প্রত্যেকটির প্রতি আকস্মিকতার সঞ্চারে নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে বেশ জমে উঠেছে। গল্প ছোট হলেও তাদের প্লট জটিল, তাদের চরিত্র বিচিত্র এবং পরিণতি গল্পের ধারা অনুসরণ করে একটা নাটকীয় 'ক্লাইমেক্স'এর সৃষ্টি করেছে সর্বত্রই। আধুনিক কালের ছোটগল্প হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের মত শুধু কাহিনীর বিবরণ নয়। তা আধুনিক কালের মতই জটিল। 'সামনে চড়াই'য়ের প্রত্যেকটি গল্প পড়ে বেশ খানিকটা অভিভূত হতে হয়। আমাদেরই অতিপরিচিত পৃথিবীতে এ যেন আর এক জগত। ছোট গল্প হিসাবে এরা সার্থক।

মঞ্জুলিকা বসু

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে শরীর ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমেই তারা পুষ্টিলাভ করে; তাই রক্তকে প্রাণরসের প্রধান উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই বিভিন্ন গঠনী ব্যাধির আক্রমণে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

সারিবাদি সালসা

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধি

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা